ইসলাম প্রচার ব্যুরো, রাবওয়া
রিয়াদ, সৌদিআরব
২০০৯—১৪৩০

ওহী ও আধুনিক বিজ্ঞান

[বাংলা - Bengali]

মাওলানা ওয়াহিদুদ্দিন খান

অনুবাদ : মুহাম্মদ শামসুল হক সিদ্দিক

ওহী ও আধুনিক বিজ্ঞান

পূর্বকথা

ফেব্রুয়ারি ১৯৫৫ সাল। লখনৌর আমিনুদ্দৌলা পার্কে আয়োজিত এক ইসলামী মহা সম্মেলনে ইসলামের বিজ্ঞানময়তা প্রমাণার্থে বক্তৃতা করতে দাঁড়ালেন মাওলানা ওয়াহিদুদ্দিন খান। বক্তৃতা শেষে যখন ঘোষণা দেয়া হয় যে, এর লিখিত কপি বুক স্টলে পাওয়া যাচ্ছে, তখন বাধভাঙ্গা বানের মতো বুকস্টলের দিকে ছুটে চলে জনতার ঢেউ। হটকেকের মতো নিমিষেই বিকিয়ে যায় সবকটি কপি। পরবর্তীতে ON THE THRESHOLD OF A NEW ERA শিরোনামে পুস্তিকা আকারে তা প্রকাশ করা হয়।

সেই থেকে ওয়াহিদুদ্দিন খান আর বসে নেই। আধুনিক যুগের জড়বাদী চিন্তা চেতনার দাঁতভাঙ্গা জবাব দিতে লিখে যাচ্ছেন গ্রন্থের পর গ্রন্থ, রচনা করে যাচ্ছেন প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৬৬ সালে প্রকাশ করেন (ধর্ম ও আধুনিক চ্যালেঞ্জ) এই বইটি ১৯৭০ সালে الإسلام يتحــدى নামে আরবীতে অনূদিত হলে মিসরের প্রখ্যাত সাহিত্যিক আহমদ বাহযাত মন্তব্য করে বললেন– ইসলামের উন্মেষকাল থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্ত ইসলামের ওপর অসংখ্য বই লিখিত হয়েছে। যদি ইতিহাসের সকল অলিগলি চষে বেড়িয়ে আলাহর পথে আহ্বানকারী গ্রন্থসমূহ চালুনি দিয়ে ছেঁকে আলাদা করা হয় তাহলে নিঃসন্দেহে "ইসলাম ও আধুনিক চ্যালেঞ্জ" তন্মধ্যে একটি হবে। দৈনিক আল- আহরাম, কায়রো, ২ জুলাই ১৯৭৩

সত্যিকথা বলতে কি ওয়াহিদুদ্দিন খান এমন এক প্রতিভা যিনি বহু সমালোচকের ভাষায় আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের মোকাবেলায় এককভাবে ইসলামের প্রতিনিধিত্ব করে যাচ্ছেন। কারণ তিনিই বর্তমান বিশ্বে একমাত্র ব্যক্তিত্ব যিনি ইসলামের সূক্ষাতিতক্ষি বিষয়কেও আয়ত্বে আনতে সক্ষম হয়েছেন। মুহাম্মদ আস সাকায়ীদ : সাপ্তাহিক আল আলামুল ইসলামী, ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৯৩ সংখ্যা ১৩২৭, বর্ষ ২৯।

ওয়াহিদুদ্দিন খান বিজ্ঞানের ভাষায় কথা বলেন। তাই তার গ্রন্থসমূহ অনুবাদ করা কিছুতেই সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। তবুও যেহেতু ইতঃপূর্বে আমি তার ১৭টি গ্রন্থ আরবীতে অনুবাদ করেছি সেই সাহসেই বাংলা ভাষায় ঋক্তহস্ত হওয়া সত্ত্বেও মহান করুণাময়ের ওপর ভরসা রেখে এ কঠিন কাজে হাত দিয়েছি।

বর্তমান বইটি ওয়াহিদুদ্দিন খান রচিত কয়েকটি প্রবন্ধের সংকলন যা বাংলা ভাষাভাষী ভাইবোনদের হাতে তুলে দিতে পেরে স্রষ্টার দরবারে লাখোকোটি শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। বইটি পড়ে ওহী, রিসালাত ও আল কুরআন সম্পর্কে বিন্দু পরিমাণও যদি কারো ভক্তি শ্রদ্ধা বেড়ে যায় তাহলে আমাদের শ্রম স্বার্থক হয়েছে বলে মনে করব।

মুহাম্মদ শামছুল হক সিদ্দিক
ঢাকা, ৩০ এপ্রিল ২০০২ ইং

বিজ্ঞানের মানদণ্ডে ওহী

আলাহর প্রতি বিশ্বাসের পরেই আসে রিসালাতে বিশ্বাসের পর্ব। রিসালাত অর্থ, বিশেষ কোন ব্যক্তির উপর স্রষ্টার পক্ষ থেকে ওহী তথা প্রত্যাদেশ আসা যাতে তিনি মানব সমাজকে স্রষ্টার ইচ্ছা- অনিচ্ছা ও মর্জি সম্পর্কে অবহিত করে দেন। স্রষ্টা এবং ওহীপ্রাপ্ত ব্যক্তির মাজে যেহেতু কোন প্রকাশ্য যোগসূত্র দৃশ্যমান নয়, সেহেতু অনেকেই ওহী ও রিসালাতের সত্যতা সম্পর্কে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভোগেন, এমনকি অস্বীকারও করে বসেন। অথচ ওহী এমন একটি বিষয় যার সত্যতা প্রমাণে বেশি দূর যেতে হয় না। বরং একেবারে সহজ কিছু ডাটা ব্যবহার করেই এর স্বরূপ সম্পর্কে পরিস্কার ধারণা নেওয়া সম্ভব।

আমাদের আশে পাশে এমন কিছু ঘটনা ঘটছে যা আমাদের সীমিত শ্রবণ ক্ষমতার বাইরে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সেগুলো আঁচ করা সম্ভব। আধুনিক কালে এমনসব মেশিনারী আবিস্কৃত হয়েছে যা ব্যবহার করে একটি চলমান মাছির আওয়াজ একেবারে কান ঘেঁষে উড়ে গেলে যেমনটি শুনায়, কয়েক মাইল দূর দিয়ে উড়ে গেলেও ঠিক তেমনি শুনতে পারা যায়। শুধু তাই নয় বরং মহাজাগতিক রশ্মি (Cosmic Rays) এর সংঘর্ষও আজকের মানুষ রেকর্ড করতে পারে। স্বাভাবিক ইন্দ্রিয়ানুভূতির বাইরে শ্রবণ ও ধারণ প্রক্রিয়াকে সহজ করার জন্য আধুনিক বিশ্বে আবিস্কৃত হয়েছে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি যা অত্যন্ত পরিস্কারভাবে প্রমাণ করে যে, স্বাভাবিক ইন্দ্রিয়ানুভূতির বাইরে কোন ঘটনা সংঘটিত হলে বৈজ্ঞানিক মানদণ্ডের দাবি অনুসারে তা অস্বীকার করা যাবে না।

আধুনিক কালে আবিস্কৃত যন্ত্রপাতির সাহায্যে শ্রবণ ও ধারণ প্রক্রিয়ার কথা বাদ দিলেও প্রাকৃতিক বিশ্বে এমনসব উদাহরণের সাক্ষাৎ মিলে যা আমাদেরকে সত্যি সত্যিই ভাবিয়ে তোলে।

মানুষের ইন্দ্রিয়ক্ষমতা নিঃসন্দেহে সীমিত। কিন্তু, প্রাণীজগতে এমন উদাহরণ মিলে যা আমাদেরকে সত্যি সত্যি ঈর্ষান্বিত করে তোলে। কুকুরের ঘ্রাণশক্তি এতই প্রবল যে, কোন রাস্তা দিয়ে বহুদূর এগিয়ে যাওয়া কোন প্রাণীর ঘ্রাণ সহজেই সে শুঁকে নিতে পারে। কুকুরের এই বিশেষ যোগ্যতা ব্যবহার করে খুব সহজেই অপরাধী ব্যক্তিদের খুঁজে বের করা যায়। ধরে নিন দরজার তালা ভেঙ্গে কোন ব্যক্তি ঘরে ঢুকে অপরাধ সংঘটিত করল। স্কোয়াড ডগ দিয়ে তালটি শুঁকিয়ে কোটি মানুষের ভেতর ছেড়ে দিলে সে ঠিক ওই ব্যক্তিকেই ধরে ফেলবে যে তালা ভেঙ্গে ঘরে ঢুকেছিল।

বিজ্ঞানীরা এমনসব প্রাণীর সাক্ষাৎ পেয়েছে যাদের Telepathy- র ক্ষমতা রয়েছে। একটি পতঙ্গ (Moth)
কোন খোলা জানালার পাশে রেখে দিলে সে বিশেষ কায়দায় ইঙ্গিত দেয়। পুরুষ পতঙ্গ বহুদূর থেকে এই ইঙ্গিত আঁচ করতে পেরে অবিলম্বে জবাব দেয়। এক প্রকার ফড়িং রয়েছে পাখা মেলে বাহু কাঁপিয়ে তার জুটিকে ডাকে। তার ডাকে সাড়া দিয়ে লাজুক স্ত্রী-ফড়িং অর্ধমাইল দূর থেকে এমন নির্বাক ইশারা প্রেরণ করে যা অন্য কারো পক্ষে টের পাওয়া সম্ভব নয়।

এক প্রকার গ্রাসহোপারের শ্রবণক্ষমতা এত তীক্ষ্ণ যে, হাইড্রোজেনের পরমাণুর অর্ধেকের সমপরিমাণের নড়াচড়াকেও সে টের পেয়ে যায়। এধরনের বহু উদাহরণ রয়েছে যা প্রমাণ করে যে, যোগাযোগের ক্ষেত্রে এমন অনেক মাধ্যম রয়েছে যা দৃষ্টিগ্রাহ্য নয়। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও বিশেষ অনুভূতিসম্পন্ন প্রাণীরা তা টের পায়। এ অবস্থায় যদি কেউ দাবি করেন যে, তিনি আলাহর পক্ষ থেকে এমন কিছু আওয়াজ পেয়েছেন যা অন্য কেউ শুনতে পায়নি, তাহলে এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

যদি এই পৃথিবীতে এমন কিছু আওয়াজ থেকে থাকে যা কেবল বিশেস যন্ত্রের সাহায্যেই শোনা যায়, যদি এমনসব ইশারা ইঙ্গিতের আদানপ্রদান হতে থাকে যা কেবল বিশেষ জন্তু-জানোয়ারই আঁচ করতে পারে, অন্য কেউ পারে না। তাহলে এতে আশ্চর্য হবার কি আছে যে, আলাহ তার বিশেষ ব্যবস্থাপনায় বিশেষ কোন ব্যক্তির সাথে গোপন সংযোগ কায়েম করে তাঁর কাছে তাঁর পবিত্র সংবাদ পাঠিয়েছেন এবং তার মধ্যে এমন যোগ্যতা সৃষ্টি করে দিয়েছেন যাতে তিনি উক্ত সংবাদ ধারণ করতে সমর্থ হন। বাস্তবতার নিরিখে দেখতে গেলে ওহী ও ইলহাম কোন দুর্বোধ্য ব্যাপার নয় বরং ওহী ও ইলহাম সাদৃশ্য অন্যান্য বহু বিষয় মানুষের অভিজ্ঞতার আওতায় এসেছে। ওহীতে বিশ্বাস করার অর্থ, একটি সম্ভাবনাকে বাস্তব ঘটনা হিসেবে মেনে নেওয়া। ওহীতে বিশ্বাস করার অর্থ কোন ঐন্দ্রজালিক বিষয়ে বিশ্বাস করা নয়।

সম্মোহনক্রিয়া এবং দূরবর্তী বিষয় সম্পর্কে বলতে পারার অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায় যে, এ যোগ্যতাটি কেবলমাত্র কিছু জীব-জন্তুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং মানুষের মধ্যেও এ ধরনের সম্ভাব্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে। ড. এলেক্সিস কারেলের ভাষায়ঃ মানুষের মনোজগতের পরিসীমা স্থান ও কালের বলয়ে কেবলমাত্র কাল্পনিক (Suppositional) হয়ে থাকে [Man the unknown p. 244] এ কারণেই কোন আওয়াজ বা মাধ্যম ছাড়াই এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির উপর তার ইচ্ছাশক্তির প্রক্ষেপণ ঘটাতে পারে এবং কৃত্রিম নিদ্রায় (Hypnotic Sleep) তাকে আবিষ্ট করতে পারে। তাকে হাসাতেও পারে কাঁদাতেও পারে। তাঁর মনোজগতে নানাবিধ চিন্তা ভাবনার উদ্রেকও ঘটাতে পারে। এটা এমন একটা ব্যাপার যেখানে বাহ্যিক কোন যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হয় না। ইচ্ছা প্রক্ষেপণকারী ও প্রভাবিত ব্যক্তির মাঝে কি হচ্ছে তা অন্য কেউ বলতে পারে না। ঠিক একই রকমের ঘটনা মানুষ এবং আলাহর মাঝে সংঘটিত হলে তা বুঝে না আসার পেছনে কোন হেতু থাকতে পারে না। আলাহর অস্তিত্ব মেনে নেয়া ও মানুষে মানুষে একে অন্যকে প্রভাবিত করার যে ক্ষমতা রয়েছে সে ব্যাপারে বাস্তব অভিজ্ঞতার পর ওহী ও ইলহামকে অস্বীকার করার কোন ভিত্তি থাকে না।

ডিসেম্বর ১৯৫০ সালের ঘটনা। বুয়েরীয়া প্রশাসন হিপনটিষ্ট ফ্রান্টার স্ট্রুবল এর বিরুদ্ধে টেলিপ্যাথির মাধ্যমে রেডিও সম্প্রচারে বিঘ্ন সৃষ্টির অপরাধে মামলা দায়ের করে। মিউনিখের রিজানা হোটেলে পারফর্মরত স্ট্রুবল দর্শকদের একজনকে একটি তাসের পাতা উঠিয়ে নিতে বলেন। তাসের নামের সাথে হোটেলের নাম সংযোজন করে ইচ্ছামত আগে পিছে করে মনে মনে কল্পনা করে নিতে বলেন। হিপনটিষ্ট তার কল্পিত বাক্যবিন্যাস অনুসারেই স্থানীয় বেতারকেন্দ্রে সংবাদ পাঠকারীর মুখ দিয়ে সম্মোহনক্রিয়ার মাধ্যমে উচ্চারণ করাবেন বলে দাবি করেন। কয়েক সেকেণ্ড অতিক্রান্ত হতে না হতেই উচ্চারিত হরো 'রিজনা হোটেল রাণী'। হোটেল ও কার্ডের নাম এবং দর্শকের কল্পলোকে মন্থিত বাক্য-বিন্যাস সম্পূর্ণ ঠিক ছিল। ওদিকে লক্ষ লক্ষ শ্রোতা এই অসংলগ্ন ঘটনার কারণ জানতে সম্প্রচার কেন্দ্রে টেলিফোন করতে লাগল। তাদের বুঝে আসছিল না যে, পঠিত সংবাদের সাথে 'রিজনা হোটেল রাণী' এ বাক্যের কি সম্পর্ক।

সংবাদ পাঠকের মানসিক অথবা শারীরিক অসুস্থতার কারণে এ সমস্যার সৃষ্টি হল কিনা তা দেখার জন্য ডাক্তার আনা হলে তিনি দেখলেন যে সংবাদ পাঠক মারাত্মকভাবে উৎক্ষিপ্ত অবস্থায় রয়েছেন। তিনি বললেন, সংবাদ পাঠের এক মুহূর্তে হঠাৎ করে একপ্রকার ব্যথা অনুভব হয়েছে। এর পর কি ঘটেছে তার কিছুই স্মরণ নেই। আমার প্রশ্ন এই যে, এক ব্যক্তি যদি বহুদূরে অবস্থিত অন্য ব্যক্তির কাছে তার কল্পনা ও চিন্তা- চেতনাকে হুবহু পাঠিয়ে দিতে পারে, তাহলে আলাহ এবং বান্দার মাঝে এ ধরনের প্রক্রিয়া কেন সংঘটিত হতে পারবে না? মানুষের জগতেই যখন এ ধরনের অনেক উদাহরণ রয়েছে, তখন অত্যন্ত সহজভাবেই বুঝা যায় যে, আলাহ এবং বান্দার মাঝে কীভাবে শব্দ ও অর্থের সম্মোহনক্রিয় সম্পন্ন হতে পারে।

সম্মোহন প্রক্রিয়ার এক ব্যক্তি তার ধ্যান- ধারণা অন্য ব্যক্তির হৃদয়তটে প্রেরণ করতে পারে। এটি একটি বৈজ্ঞানিক সত্য। এর সাহায্যে আমরা ওই মহাজাগতিক সম্মোহন ক্রিয়া সম্পর্কে ধারণা নিতে পারি, যাকে ধর্মীয় পরিভাষায় ওহী বলা হয়।

ওহী মূলত এক প্রকার মহাজগতিক সম্মোহন, যার সীমিত মানবিক রূপ সম্পর্কে আমাদের ধারণা হয়েছে।

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে ওহীর সম্ভাবনা ও বাস্তবতাকে মেনে নিলে যে প্রশ্নটি সামনে আসে, তা হল ওহীর প্রয়োজনীয়তার ব্যাপার। অর্থাৎ বিশেষ কোন ব্যক্তিকে পছন্দ করে স্রষ্টার পক্ষ থেকে ওহী প্রেরণের কি আদৌ কোন প্রয়োজনীয়তা আছে?

অবশ্যই আছে; কারণ প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তি তথা রাসূল মানুষকে এমন বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান দেন যা মানুষের জন্য জল বায়ুর মতই প্রয়োজন, কিন্তু মানুষ তার নিজস্ব চেষ্টা-সাধনায় এ প্রয়োজনটি কখনই মেটাতে পারে না।

সত্যের সন্ধানে মানুষ শতসহস্র বছর কাটিয়ে দিয়েছে। চলে গেছে প্রজন্মের পর প্রজন্ম। মানুষ জানতে চেয়েছে তার নিজের পরিচয়, মহাবিশ্বের পরিচয়? ভালো কোনটি, মন্দ কোনটি? কীভাবে মানুষের কল্যাণে এ পৃথিবীর জীবনকে সুন্দর করা যাবে। কিন্তু মানুষ আজও পর্যন্ত এই অনুসন্ধানকর্মে সফলকাম হয়নি।

কিছুকালের অনুসন্ধান ও গবেষণায় আমরা লোহা ও পেট্রোলের রহস্য জগতকে উন্মোচিত করতে সমর্থ হলাম। রপ্ত করতে পারলাম প্রাকৃতিক বিশ্বের শতসহস্র বিষয়ের সঠিক জ্ঞান। কিন্তু মনুষ্যবিজ্ঞান এখন পর্যন্ত অনাবিস্কৃতই থেকে গেছে। উন্নততর মেধাসমূহের শত চেষ্টা-সাধনা আজও পর্যন্ত এ ক্ষেত্রের অ আ পর্যন্ত আবিস্কার করতে পারেনি। এটা একটা বড় প্রমাণ যে স্রষ্টার করুণা ও সাহায্য ছাড়া মানুষ তার জীবনপথ ও জীবনরহস্যকে কক্ষনই আবিষ্কার করতে পারবে না। নোবেল প্রাইজ বিজয়ী এলেক্সিস কারেলের বক্তব্য অনুসারে আধুনিক প্রযুক্তির সৃষ্ট নয়া বিশ্বপরিবেশের সাথে মানব সত্ত্বার অসংলগ্নতার পিছনে কারণ এই যে, একদিকে জড়জগৎ সংক্রান্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রসার লাভ ঘটেছে, অন্যদিকে মানুষ সংক্রান্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে থেকে গেছে। এই দ্বিতীয় শাখায় যারা কাজ করছেন তারা সত্যের মোহনায় পৌঁছুতে পারেননি। তারা তাদের কল্পলোকে অহেতুক ঘুরপাক খেয়ে কেবলই হতাশ হচ্ছেন।

এলেক্সিস কারেল বলেন, ফরাসি বিপবের মূলনীতি ও মার্কস লেনিনের মতবাদের প্রয়োগ কেবলমাত্র কাল্পনিক মানুষের উপর হতে পারে, কারণ এটা পরিস্কারভাবে বুঝা প্রয়োজন যে, মানবিক সম্পর্ক সংক্রন্ত আইন কানুন (দ্র : Law of Human relation) এখন পর্যন্ত অনাবিস্কৃত রয়ে গেছে। সমাজ ও অর্থনীতি সংক্রন্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান নিছক ধারণানির্ভর এবং অকাট্যভাবে প্রমাণযোগ্য নয়। (Man the Unknown p-37)

বর্তমান যুগে বিজ্ঞান বহুদূর এগিয়ে গিয়েছে বটে কিন্তু বিজ্ঞানের এ বিজয় অনেকটা কাটা ঘায়ে লবণ ছিটিয়ে দেবার মতোই। গুরুত্বপূর্ণ মানবিক সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে বিজ্ঞান এখনও কোন ভূমিকা রাখতে পারেনি। J.W.N. Sullivan বলেন, বিজ্ঞান আধুনিককালে যে বিশ্ব আবিস্কার করেছে, তা মানবচিন্তার দীর্ঘ ইতিহাসে সমধিক রহস্যজনক। বর্তমানে প্রকৃতির ব্যাপারে আমাদের জ্ঞান মানবেতিহাসের যে কোন যুগের তুলনায় অনেক বেশি, কিন্তু এ জ্ঞানভাণ্ডার খুব কমই আশার সঞ্চার করেছে। কারণ, যে দিকে তাকাই দেদিকেই অনিশ্চয়তা (Ambiguities) এবং বৈপরিত্ব (Contradictions) আমাদের অস্তিত্বকে বিষিয়ে তুলছে। বস্তুতান্ত্রিক বিজ্ঞানের বলয়ে জীবনরহস্য উদঘাটন করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। [দ্রঃ Limitation of science p.1]

একদিকে অবস্থা এই যে, জীবনরহস্য উদঘাটন এবং জীবনের স্বরূপ সম্পর্কে জ্ঞানার্জন আমাদের জন্য অপরিহার্যভাবে প্রয়োজন; কারণ এ রহস্যজ্ঞান ব্যতীত আমাদের উত্তম আবেগসমূহ থেকে যায় তৃষ্ণার্ত, আমাদের চিন্তাশক্তি থেকে যায় অপরিতৃপ্ত, বরং আমাদের জীবনের পুরা সিস্টেমটাই পড়ে থাকে নির্ঘাৎ এলোমেলো অবস্থায়। অন্য কথায় বলতে গেলে, জীবনরহস্য আবিস্কার আমাদের জীবনের বড় প্রয়োজন। কিন্তু এই বড় প্রয়োজনটা আমরা নিজেরা কিছুতেই পূরণ করতে পারি না।

মানুষের ঐশিক দিকনির্দেশনা তথা প্রত্যাদেশের প্রয়োজন রয়েছে, এ সত্যটি প্রমাণের জন্য উপরোলিখিত সমস্যাটি দলিল হিসেবে যথেষ্ট। জীবনরহস্য উদঘাটন অতি জরুরি হওয়া সত্ত্বেও মানুষের আবিস্কার ক্ষমতার বাইরে থাকা এটাই প্রমাণ করছে যে, অন্য কোন উৎস থেকে এ ব্যাপারে দিকনির্দেশনা নেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। যেমনটি ঘটেছে আলোও তাপের বেলায়। আলো ও তাপ মানুষের জন্য অতি প্রয়োজনীয় হওয়া সত্ত্বেও তা রাখা হয়েছে মানুষের ক্ষমতার বাইরে। আলাহ পাক মানুষের এই পৃথিবীর বাইরে অবস্থিত সূর্যের মাধ্যমে এ প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা করেছেন।

রাসুল যাচাইয়ের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি

ওহীর প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে নিলে আমাদের দেখতে হবে যে, যে ব্যক্তি ওহী প্রাপ্তি তথা প্রত্যাদিষ্ট হওয়ার দাবি করেছেন, তিনি কি সত্যি সত্যি ওহী পেয়েছেন? নাকি মিথ্যা ও বানোয়াট দাবি করেছেন? আমাদের ধর্মবিশ্বাস অনুসারে অনেকের উপরই ওহী এসেছে, কিন্তু সর্বশেষ রাসূল মুহাম্মদ সালালাহু আলাইহি ওয়া সালাম সম্পর্কে আলোচনা করব; কারণ তাঁর নবুওত প্রমাণিত হয়ে গেলে অন্যান্য নবীদের নবুওতও স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রমাণিত হয়ে যায়। কারণ তিনি অন্যান্য নবীদেরকে স্বীকার করেছেন এবং তাদের প্রতি সবাইকে বিশ্বাস স্থাপন করতে বলেছেন। উপরোক্ত মুহাম্মদ সালালাহু আলাইহি ওয়া সালাম যেহেতু বর্তমান ও ভবিষ্যতের সকল মানব প্রজন্মের জন্য একমাত্র রাসূল, যার পরে অন্য কোন রাসূল আসবেন না, সেহেতু মানবগোষ্ঠীর মুক্তি অথবা ধ্বংসের ব্যাপারটা মুহাম্মদ সালালাহু আলাইহি ওয়া সালাম-কে মানা না মানার উপর নির্ভরশীল।

ঘটনা প্রবাহ

২৯ আগষ্ট ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দে মুহাম্মদ সালালাহু আলাইহি ওয়া সালাম জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি যখন চলি-শে উপনীত হন তখন দাবি করেন যে, স্রষ্টা তাঁকে নবী বানিয়েছেন ও তাঁর উপর ওহী প্রেরণ করেছেন এবং বিশ্বের প্রতিটি মানুষের কাছে ওহীর বাণী পৌঁছে দিতে বলেছেন। সাথে সাথে এও বলতে আদিষ্ট হয়েছেন যে, যে ব্যক্তি তার অনুসরণ করেব তার মর্যাদা হবে উর্ধ্বে, স্বর্গলোকে। পক্ষান্তরে যে তাঁকে অমান্য করবে তার প্রতিদান হবে উত্তপ্ত নরক।

শেষ নবীর এই দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা আমাদের মাথার উপর এখনও গুঞ্জনরত। তাঁর এ ঘোষণা কোন সহজ সরল ঘোষণা নয়, বরং এটা এমন একটা ঘোষণা যা প্রতিটি মানুষকে এক ভয়াবহ পরিণতির ব্যাপারে হুঁশিয়ার করে দিচ্ছে। এ ঘোষণার দাবি অনুসারে প্রতিটি মানুষের উপর অবশ্যম্ভাবী হয়ে যায় যে এ ব্যাপারটিকে অত্যন্ত গুরুত্বসহ নেবে এবং ঐকান্তিকতার সাথে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে এর সত্যতা যাচাইয়ের জন্য সচেষ্ট হবে। কারণ, মৃত্যুর পরই রাসূলের বর্ণিত সেই ভয়ঙ্কর পরিণতির মোকাবেলা করতে হবে। তাই রাসূল তাঁর দাবিতে সত্য কি না তা বৈজ্ঞানিক গবেষণা-পদ্ধতির আলোকে সত্য বলে প্রমাণিত হ তো নিদ্বিধায় মেনে নিয়ে রাসূলের নির্দেশিত পথ অনুসারে জীবন পরিচালনা করে ভয়াবহ পরিণতি থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে নেয়ার প্রস্তুতি নিতে হবে।

এবার দেখা যাক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে শেষনবীর নবুওত দাবীর সত্যতা প্রমাণিত হয় কি না। কোন বিষয়কে বিজ্ঞানসম্মত বলতে হলে তাকে তিনটি পর্যায় পেরুতে হয়:

১. Hypothesis (প্রকল্প বা ধারণা)
২. Observation (পর্যবেক্ষণ)
৩. Verification (সত্যতা প্রমাণ)

প্রথমে কোনো বিষয়ের সত্যতা প্রমাণার্থে একটি ধারণা উপস্থাপন করা হয় যাকে প্রকল্প বলে। তারপর উক্ত প্রকল্পকে কেন্দ্র করে প্রয়োজনীয় পরীক্ষা নিরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ চলে। পর্যবেক্ষণের পর আসে উক্ত প্রকল্পের সত্যতা প্রতিষ্ঠার পালা।

উপরোক্ত অনুক্রমে হয়ত কখনও ব্যতিক্রমও হতে পারে, এমনও হতে পারে যে, প্রথমে কিছু পর্যবেক্ষণ সামনে আসবে এবং দ্বীতিয় পর্যায়ে তা থেকে একটি প্রকল্পের জন্ম নেবে। প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা যদি উক্ত প্রকল্প সঠিক বলে প্রমাণিত হয়, তাহলে তা বৈজ্ঞানিক সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত হবে। এ মূলনীতি অনুসারে নবীর নবুওত দাবিকে যদি প্রকল্প হিসেবে সাব্যস্ত করি, তাহলে আমাদের দেখতে হবে, পর্যবেক্ষণ দ্বারা এ প্রকল্পের সত্যতা প্রমাণিত হয় কিনা । যদি পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা- নিরীক্ষা দ্বারা এর সত্যতা প্রমাণিত হয় তাহলে এটা পরীক্ষিত সত্য (Verified fact) হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে এবং একটি বৈজ্ঞানিক সত্য হিসেবে এতে বিশ্বাস করা প্রতিটি মানুষের জন্য জরুরি হয়ে পড়বে।

এখন দেখা যাক কি সেই পর্যবেক্ষণসমূহ যার মাধ্যমে মুহাম্মদ সা. এর নবুওত দাবি সত্য না মিথ্যা, তা বৈজ্ঞানিক মানদণ্ডের আলোকে যাচাই করা যাবে। কী সেই লক্ষণসমূহ যার আলোকে নিশ্চিত হওয়া যাবে যে, মুহাম্মদ সা. বাস্তবেই একজন রাসূল তথা আলাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত পুরুষ ছিলেন।

আমার মতানুসারে নিম্ন বর্ণিত বৈশিষ্ট্যসমূহ কোন নবী ও রাসূলের মধ্যে উপস্থিত থাকা অপরিহার্যভাবে প্রয়োজন:

তিনি অস্বাভাবিক রকমের আদর্শ মানুষ হবেন। কারণ, যাকে স্রষ্টা তাঁর পবিত্র প্রত্যাদেশ গ্রহণের জন্য পছন্দ করবেন এবং যার মাধ্যমে জীবনগঠনের যাবতীয় পান- প্রোগ্রাম বাতলানো হবে তাকে অবশ্যই সর্বোত্তম ব্যক্তি হতে হবে এবং যে আদর্শ তিনি প্রচার করবেন তার পূর্ণাঙ্গ প্রতিফলন তাঁর জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে পরিলক্ষিত হতে হবে। যদি তাঁর জীবনে এ আদর্শগুলোর পূর্ণাঙ্গ প্রতিফলন দেখা যায় তাহলে বুঝতে হবে, তাঁর দাবিতে তিনি সত্য। কারণ, মিথ্যা হলে এ আদর্শগুলো বিশাল মহিরুহ আকারে তাঁর জীবনে প্রকাশ পেত না এবং বিশ্ববাসী তাঁকে সমধিক বলিষ্ঠ চরিত্রের অধিকারী হিসেবে আখ্যায়িত করত না।

তাঁর কথা ও কাজে এমন বৈশিষ্ট্য থাকবে, যা হবে সম্পূর্ণই অসাধারণ এবং সর্বসাধারণের নাগালের বাইরে। এ দুটো মানদণ্ডের আলোকে পরখ করলে বুঝা যাবে যে, মুহাম্মদ সা. এর নবুওত দাবি সত্য না মিথ্যা।

চলিশ বছর বয়সে তিনি নবুওত প্রাপ্ত হন। এ চলিশ বছরের দীর্ঘ ইতিহাসে তিনি সকল প্রকার চারিত্রিক মাধুর্য সজ্জিত হয়ে উজ্জ্বল ভাস্করের মতো জ্যোতি বিকিরণ করে যান। তাঁর চারিত্রিক ঔজ্জ্বল্যে প্রভাবিত হয়ে সবাই তাঁকে সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত বলে আখ্যায়িত করে। তাঁর সম্পর্কে তদানিন্ত ন বিশ্বের অবিসংবাদিত মন্তব্য এরকম ছিল যে, তিনি অস্বাভাবিক রকমভাবে ভালো মানুষ ছিলেন এবং কখনও মিথ্যা বলতেন না।

নবুওত দাবি করার পাঁচ বছর পূর্বে কোরেশরা নতুন করে কা'বা ঘর নির্মাণ করতে উদ্যোগ নেয়। নির্মাণ কাজ শুরু হলে হাজরে আসওয়াদকে তার পূর্বের জায়গায় স্থাপনের ব্যাপারে বাদানুবাদ শুরু হয়। চার-পাঁচ দিন পর্যন্ত এ বাদানুবাদ চলতে থাকে, কিন্তু কোন মীমাংসায় আসা সম্ভব হয় না। এমন কী শেষ পর্যায়ে যুদ্ধ বেঁধে যাওয়ার উপক্রম হয়। পরিশেষে সিদ্ধান্ত হয় যে, আগামী কাল প্রত্যুষে যে ব্যক্তি সর্বপ্রথম বায়তুলায় প্রবেশ করবে সেই এ ব্যাপারে ফায়সালা দেবে। পরদিন যখন কোরেশরা সর্ব প্রথম প্রবেশকারীকে প্রত্যক্ষ করল, তখন সবাই একবাক্যে বলে ওঠল, তিনি বিশ্বস্ত আমরা তাঁর ফয়সালা মেনে নিতে একমত।

هذا الأمين رضينا.

গোটা মানবিতিহাসে এমন কোন ব্যক্তির সাক্ষাৎ মিলবে না যিনি সকল প্রকার বিতর্কের ঊর্ধ্বে থেকে এমনভাবে চলিশটি বছর কাটিয়েছেন যে সবাই তাঁর চরিত্র ও মহত্বের ব্যাপারে এভাবে ঐক্যমত পোষণ করবে।

হেরার গুহায় যখন প্রথমবার ওহী আসে, তখন তিনি চরমভাবে উৎকণ্ঠিত হয়ে বাড়ি ফিরেন এবং তাঁর স্ত্রী খাদিজা রাদিয়ালাহু আনহা-কে - যিনি বয়সে তাঁর চেয়ে বড় ছিলেন- ঘটনার বিবরণ শুনান। জবাবে তিনি বললেন, ওগো আবুল কাসেম! আলাহ আপনাকে অবশ্যই হিফাযত করবেন; কেননা আপনি সত্যকথা বলেন। আপনি দিয়ানতদার। আপনি খারাপের প্রতিদানে ভালো দেন এবং মানুষের অধিকার আদায় করেন।

আবু তালেব নবী সা. এর চাচা ছিলেন। নবী সা. যখন তাকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন তখন তিনি এই বলে অস্বীকার করলেন যে, বাব-দাদার ধর্ম তিনি পরিত্যাগ করতে পারবেন না। কিন্তু পরবর্তীতে যখন নিজের ছেলে আলীর রা. ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার কথা শুনলেন তখন তিনি ছেলেকে ডেকে বললেন : বৎস! তুমি এ ব্যাপারে স্বাধীন; কারণ আমার দৃঢ়বিশ্বাস মুহাম্মদ ভালো ব্যতীত অন্য কিছুর দিকে তোমাকে ডাকবে না।

নবুওত প্রাপ্তির পর ছাফা পাহাড়ের পাদদেশে লোকদেরকে সমবেত করে বললেন : আমার ব্যাপারে আপনাদের কী অভিমত? সবাই একবাক্যে বলল: আপনার ব্যাপারে সত্য ছাড়া অন্য কিছুর অভিজ্ঞতা আমাদের নেই।

রাসূলুলাহর নবুওতপূর্ব-জীবন সম্পর্কে এটা এমন একটা বেকর্ড যা সমগ্র মানবিতিহাসে কোন কবি, চিন্তাবিদ অথবা লেখকের জীবনে পাওয়া যাবে না। মুহাম্মদ সা. যখন প্রেরিত হওয়ার ঘোষণা দিলেন, তখন মক্কার লোকদের হৃদয়ে কখনই এ ধরনের সন্দেহের উদ্রেক হয়নি যে মুহাম্মদ সা. মিথ্যা বলেছেন। কারণ, তাঁর দীর্ঘ জীবনইতিহাস মিথ্যাচারিতা থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র। এ জন্য কখনও তারা মুহাম্মাদ সা. কে মিথ্যা সংক্রন্ত অপবাদ দেয়ার কল্পনাও করেনি। বরং তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করতে গিয়ে তাদের উন্মত্ততায় পেয়েছে, সে কাব্যগাঁথা গাইতে শুরু করেছে, অথবা তাঁকে জীন-পরী আছর করেছে, এসব কিছুই তারা বলেছে কিন্তু কারও সাহস হয়নি যে, রাসূলুলাহর সত্যবাদিতা ও ইমানদারিতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ করবে। এটা আসলেই আশ্চর্যের ব্যাপার যে, গোটা জাতি যে খানে তাঁর শত্রুতে রূপান্তরিত হয়েছে এবং পৈত্রিক ভিটে-ভাড়িতে যার বসবাস পর্যন্ত অসম্ভব হয়ে উঠেছে, সেই ব্যক্তি সম্পর্কে ইতিহাস বলবে যে, মক্কায় এমন কেউ নেই যার কাছে মূল্যবান কিছু রয়েছে অথচ তা রাসূলুলাহর কাছে তাঁর সত্যবাদিতা ও আমানতদারীর কারণে গচ্ছিত রাখেনি।

ليس بمكة أحد عنده شيئ يخشى عليه إلا وضع عنده لما يعلم من صدقه وأمانته

নবুওতের ত্রয়োদশ সালে যখন বিরুদ্ধাচরণকারীরা তাঁর জীবন সংহারের জন্য দৃঢ়সংকল্প হয়ে তাঁর বাড়ির চারপাশ ঘিরে এমনভাবে দাঁড়িয়েছিল যে, বের হওয়া মাত্র সম্মিলিতভাবে আক্রমণ করবে, ঠিক

সেই মুহূর্তে প্রাণপ্রিয় সহচর আলী ইবনে আবু তালেব রা. কে উপদেশ দিচ্ছিলেন যে, অমুক অমুকের সম্পদ আমার কাছে গচ্ছিত রয়েছে, আমার যাবার পর প্রত্যেককে তার সম্পদ বুঝিয়ে দেবে।

নসর ইবনে হারীস, যিনি রাসূলের বিরোধী হওয়ার সাথে সাথে পার্থিব বিষয়াদি সম্পর্কে কোরেশদের মধ্যে সমধিক অভিজ্ঞ ছিল, একদিন কোরেশদেরকে খেতাব করে বলল : হে কোরেশগণ! মুহাম্মদ তোমাদেরকে এমন কী সমস্যায় ফেলেছে যার কোন সমাধান খুঁজে পাচ্ছ না? সে তো তোমাদের চোখের সামনেই বড় হল। তোমরা ভালোভাবেই জান, সে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সত্যবাদী, সবচেয়ে বেশী আমানতদার ও সমধিক প্রিয় ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু যখন তার চুল সাদা হতে চলেছে এবং সে ওই দাবি উত্থাপন করেছে যা তোমরা শুনছ, তখন তোমরা বলতে লাগলে, এ ব্যক্তি যাদুকর, এ কবি, এ উন্মাদ। আলাহকে সাক্ষী রেখে বলছি, আমি মুহাম্মদের কথা শুনেছি; মুহাম্মদ জাদুকর নয়, সে কবি নয়, সে উন্মাদও নয়। আমার আশঙ্কা হয়, নতুন কোন বিপদ তোমাদেরকে গ্রাস করে না বসে।

আবু জেহেল বাসূলুলাহর সা. ঘোর শত্রু ছিল। সে একদা রাসূলুলাহকে সা. বলল : মুহাম্মদ ! আমি বলি না যে তুমি মিথ্যা বলছ। কিন্তু তুমি যা প্রচার করছ তা আমি শুদ্ধ বলে মনে করি না (সিরাতে ইবনে হিশাম, খণ্ড-১, পৃ-৩১৯।

রাসূলুলাহর নবুওত কেবল আরবদের জন্য ছিল না বরং তিনি ছিলেন সমগ্র বিশ্ববাসীর নবী। তাই তিনি তাঁর জীবদ্দশাতেই প্রতিবেশী দেশসমূহের রাজা বাদশাহদেরকে ইসলামের দিকে আহবান করে তাদের চিঠি প্রেরণ করেন।

রুম সম্রাট হিরাকল রাসূলুলাহর পত্র পেয়ে সিরিয়ায় সফররত কোরেশদের বাণিজ্যদলকে তাঁর দরবারে তলব করলেন। সম্রাটের দরবারে হাজির হলে তিনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন : আপনাদের এলাকায় যে ব্যক্তি নবী হওয়ার দাবি করছে, এখানে কেউ কি তাঁর আত্মীয় রয়েছেন? আবু সুফিয়ান বলল : সে আমার বংশধর, জাহাঁপনা! এর পর হিরাকল আবু সুফিয়ানকে কিছু প্রশ্ন করলেন :

এই দাবি উত্থাপনের পূর্বে আপনারা কি কখনও তাঁকে মিথ্যা বলতে শুনেছেন?

আবু সুফিয়ান : কক্ষনও না।

হিরাকল : সে কি কখনও কোন অঙ্গীকার ভঙ্গ করে?

আবু সুফিয়ানঃ কখনো তাকে অঙ্গীকার ভঙ্গ করতে দেখিনি।

বর্ণনা শুনে হিরাকল বললেন, ঘটনা যদি এই হয় যে, তিনি মানুষের ব্যাপারে কখনও মিথ্যা বলেননি তাহলে স্রষ্টার ব্যাপারে এতবড় মিথ্যা বলা তার পক্ষে সম্ভব নয়।

আবু সুফিয়ানের এ স্বীকারোক্তিগুলো সে সময়কার, যখন আবু সুফিয়ান শুধু যে ইসলাম গ্রহণ করেনি তা নয়, বরং রাসূলুলাহর বিরুদ্ধে পরিচালিত যুদ্ধ- জঙ্গে সে ছিল একজন পুরোধা। আবু সুফিয়ান নিজেই স্বীকার করেছে যে, হিরাকল এর দরবারে উপস্থিত অন্যান্য কোরেশরা তাকে মিথ্যাবাদী বলে প্রচার করবে, এ আশঙ্কা না হলে ঐ দিন সে মিথ্যা বলত। (বুখারী ‘‘কীভাবে রাসুলুলাহ স. এর প্রতি ওহী নাযিল শুরু হল’’ অধ্যায়)

সমগ্র ইতিহাসে এমন কোন ব্যক্তি খুঁজে পাওয়া যাবে না যার বিরুদ্ধাচরণকারীরা কঠোর শত্রুতায় বিভোর হওয়া সত্ত্বেও তার পক্ষে এ ধরনের সাক্ষী দেবে। এ ঘটনাটি নিশ্চিতরূপে মুহাম্মদের সা. নবী হওয়ার ব্যাপারে একটি নির্ভরযোগ্য প্রমাণ। এক্ষেত্রে ড. লেডজ এর বক্তব্য বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, ‘‘আমি অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বলতে সাহস করছি যে, যদি কেউ সত্যি সত্যি প্রভুর পক্ষ থেকে প্রত্যাদেশ পেয়ে থাকেন, তাহলে একমাত্র মুহাম্মদের ধর্মকে প্রত্যাদিষ্ট ধর্ম রূপে স্বীকার করতে হবে। যদি ত্যাগ, দিয়ানতদারী, গভীর বিশ্বাস, ভালোমন্দ যাচাইয়ের উন্নততর মানদণ্ড এবং অন্যায় ও পাপ বিমোচনের উত্তম মাধ্যমসমূহই ঐশিক প্রত্যাদেশ প্রাপ্তির প্রমাণ হয়ে থাকে তাহলে মুহাম্মদের মিশন নিঃসন্দেহে প্রত্যাদিষ্ট মিশন ছিল। ’’

তিনি যখন ইসলামের দিকে আহবান শুরু করলেন তখন তাঁকে অনেক কষ্ট-নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে। নিজ গোত্রের লোকেরা তাঁর পথে কাঁটা বিছিয়ে দিয়েছে, নামাজ পড়তে গেলে তাঁর মাথায় ময়লা চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। হারাম শরিফে নামাজ আদায়ের সময় উকবা ইবন আবু মুয়ীৎ একদা রাসূলুলাহর গলায় চাঁদর পেচিয়ে এমন ভীবৎসভাবে টান দেয় যে, রাসূলুলাহ সা. মাটিতে পড়ে যান।

এ ধরনের অত্যাচার নির্যাতনে যখন কোন কাজ হল না, তখন রাসূলুলাহ ও তাঁর আত্মীয়-স্বজনদেরকে এলাকাবাসীরা বয়কট করে। নির্জন এক পাহাড়ের পাদদেশে আত্মীয়-স্বজনসহ রাসূল-কে আশ্রয় নিতে হয়।

এ সময় অতি প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র এমনকি খাদ্যদ্রব্য নিয়েও কোন ব্যক্তি রাসূলুলাহর কাছে পৌঁছতে পারতো না। তাদের সাথে কোন বেচা- কেনা দীর্ঘ তিন বছর পর্যন্ত বন্ধ ছিল। নবী মুহাম্মদ তাঁর আত্মীয়-স্বজনসহ এত কষ্টে জীবন কাটালেন যে, পাহাড়িয়া গাছ (তালহ) এর পাতা খেয়ে জীবন ধারণ করতে হয়েছে। রাসূলের এক সাথী বর্ণনা করেন যে, একবার আমার হতে একটি শুকনো চামড়া আসে। আমি পানি দিয়ে চামড়াটি ধুয়ে নেই, আগুনে ভুনা করি এবং পানিতে চুবিয়ে তা খাই। মক্কাবাসীদের এই অমানষিক আচরণ ও নির্দয় স্বভাব দেখে রাসূলুলাহ তায়েফ গমন করলেন। মক্কা থেকে চলিশ মাইল দূরে অবস্থিত তায়েফ ধনাঢ্য লোকদের আবাসভূমি হিসেবে পরিচিতি ছিল। তায়েফের লোকেরা রাসূলের সাথে অসদাচরণ করল। একজন বলল : রাসূল বানানোর জন্য আলাহ বুঝি তোমাকে ছাড়া আর কাউকে পেলেন না? তায়েফবাসীরা কটুবাক্য ব্যবহার করেই ক্ষান্ত হয়নি বরং সেখানকার উন্মত্ত জোয়ান ও বালকদেরকে রাসূলের পেছনে লেলিয়ে দেয়। এর রাসূলকে লক্ষ্য করে এমনভাবে প্রস্তর নিক্ষেপ শুরু করে যে রাসূলের পবিত্র দেহ রক্তে রঞ্জিত হয়ে যায়। বেদনায় কাতর হয়ে বসে পড়লে ওরা রাসূলকে দাঁড় করিয়ে দেয় এবং আবার চলতে শুরু করলে প্রস্তর নিক্ষেপ আরম্ভ করে। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে ওরা যখন চলে যায় তখন আঙ্গুর গাছের আড়ালে তিনি আশ্রয় নেন। এই সেই বেদনাদায়ক ঘটনা যার ব্যাপারে আম্মাজান আয়েশাকে একদা বলেছিলেন : আমি তোমার কাউমের বহু অন্যায় অত্যাচার সহ্য করেছি তবে আকাবার দিন তাদের অন্যায় অত্যাচার নিতান্তই দুঃসহনীয় ছিল।

لقد لقيت من قومك مالقيت وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة

এতসব অন্যায়-অত্যাচার ও দূর্বিসহ কষ্ট সত্ত্বেও তিনি তাঁর কর্ম থেকে বিন্দুমাত্র পিছপা হননি। কোরেশরা তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করে কোন সফলতা অর্জন করতে পারেনি। পরিশেষে তারা রাসূলের জীবনবধ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। অতঃপর একবার উন্মুক্ত তরবারি হাতে কোরেশদের জোয়ানরা রাসুলের বাড়ি ঘেরাও করে বসে যায়। প্রত্যুষে তিনি আলাহর বিশেষ করুণায় নির্বিঘ্নে ঘর থেকে বের হয়ে যেতে সক্ষম হন এবং হিজরত করে মদিনায় গিয়ে বসবাস করতে শুরু করেন।

হিজরতের পর কোরেশরা রাসূলুলাহ সা. এর বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভিযানে লিপ্ত হয়। দীর্ঘ দশ বছরকাল তারা রাসূলুলাহ ও তাঁর সহচরবৃন্দকে যুদ্ধ-জঙ্গে জড়িয়ে রাখে। এসব যুদ্ধে রাসূলের বহু প্রাণপ্রিয় সহচর ও সঙ্গীগণ নিহত হন এবং যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে যে সব দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে হয় তা সবাই তিনি সহ্য করেন। এভাবে টানা তেইশ বছরের দুঃখবিজড়িত ইতিহাসের পর জীবনের শেষ দিনগুলোতে যখন মক্কা জয় হয়, তখন শত্রুপক্ষ অবনত মস্তকে রাসূলুলাহর সা. সামনে এসে দাঁড়ায়। এসময় জীবনের কোন দুঃখ-কষ্টের প্রতিশোধ নেওয়ার কোন চিন্তাই তিনি করলেন না। শুধু তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের সাথে কী ধরনের আচরণ করব বলে মনে কর? তাঁরা বলল : দুয়াল ভাই এবং দয়ালু ভাইয়ের ছেলে। রাসূলুলাহ সা. বললেন, যাও। তোমরা স্বাধীন।

إذهبوافأنتم الطلقاء

উন্নত চরিত্রের এই উদাহরণটি গোটা মানবিতিহাসে এমন একটি অলৌকিক ঘটনা যা প্রগৈতিহাসিক যুগে ঘটলে নিছক কল্পকাহিনী বলে উড়িয়ে দেওয়া হতো। কারণ, এ ধরনের মহানুভবতাসম্পন্ন মানুষ আজ পর্যন্ত কোথাও সৃষ্টি হয়নি।

প্রফেসর বুসওর্থ স্মিথ যর্থাথই বলেছেন যে, যখন তাঁর সামগ্রিক গুণাবলি ও কর্মকাণ্ডসমূহকে একীভূত করে দেখি এবং ভাবি যে তিনি কী ছিলেন এবং কী হয়ে গেলেন। তাঁর অনুসারীগণ, যাদের মধ্যে জীবনের স্পিরিট ফুঁকে দিয়েছিলেন, কী সব সাফল্যই না দেখালেন! তখন তিনি আমার কাছে ইতিহাসের একমাত্র বড় ও সুমহান ব্যক্তি হিসেবে দেখা দেন, যার উদাহরণ তিনি নিজেই। [Mohammad and Mohammedanism p-344]

শুধু তাই নয় বরং অর্থ-সম্পদ ও পার্থিব ঐশ্বর্যের বেলায় তিনি যে মহানুভবতার পরিচয় দিয়েছেন তার উদাহরণও তিনি নিজেই। নবুওত প্রাপ্তির পূর্বে তিনি মক্কার একজন সফল ব্যবসায়ী ছিলেন। আরব

এলাকার এক ধনাঢ্য মহিলা খাদিজা ছিলেন তার স্ত্রী। কিন্তু রিসালাতের দায়িত্ব অর্পিত হওয়ার পর তাঁর ব্যবসা ও খাদিজার সম্পদ আলাহর রাস্তায় ব্যয় করে দিলেন। রিসালাতের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে তাঁকে এত কষ্ট করতে হয় যে, তিনি একদা বললেন : আলাহর রাস্তায় এত কষ্ট সহ্য করেছি যা অন্য কেউ কখনও করেনি। মেশকাত : কিতাবুররিকাক

তিনি কেবল তার মিশনের খাতিরে এতসব সহ্য করেছিলেন। তা না হলে, জীবনে সফলকাম হওয়ার সকল ক্ষেত্র তাঁর সামনে উন্মুক্ত ছিল। যখন তিনি মক্কায় ছিলেন, তখন ওকবা নামক এক ব্যক্তি রাসূলুলাহর দরবারে আরজ করে বলল, "ভাতিজা! যদি এই ধর্ম প্রচারের পিছনে দুনিয়া উপার্জন করা তোমার উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তাহলে বলো, আমরা তোমার জন্য এত সম্পদ জমা করে দিই যে তুমি আমাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্পদশালী হয়ে যাবে। আর যদি সুন্দরী কোন নারীর সান্নিধ্য চাও, তাহলে এসো সবচেয়ে সুন্দরীর সাথে তোমার বিয়ে দিই। আর যদি রাজা বাদশা হওয়া উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তাহলে এসো তোমাকে আমাদের রাজা বানিয়ে দিই। আর যদি এমন হয় যে, তুমি এক প্রকার উন্মত্ততায় ভুগছ এবং এমন কিছু দেখছ যা দূর করতে পারছ না তাহলে বলো, আমরা তোমার চিকিৎসার ব্যবস্থা করি।"

রাসূলুলাহ স. ওকবার বক্তব্য নীরবে শুনে গেলেন। প্রত্যুত্তরে তিনি কুরআনের কয়েকটি আয়াত পড়ে শুনিয়ে দিলেন (সিরাতে ইবনে হিশাম, খণ্ড-১,পৃ-৩১৪)

মদিনায় তিনি বিশাল রাষ্ট্রের অধিপতি ছিলেন। রাসূলের এমন জানবাজ আত্মোৎসর্গী সঙ্গী-সাথী ছিলেন, ইতিহাসে যাদের কোন তুলনা খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি অত্যন্ত স্বাভাবিক জীবনযাপন করেছেন। ওমর রা. বর্ণনা করেন : একদা আমি রাসূলুলাহ সা. এর কক্ষে প্রবেশ করি। রাসূলুলাহ খালি গায়ে খেজুরের চাটাইয়ে শুয়ে আছেন। তাঁর পবিত্র দেহে চাটাইয়ের দাগ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। কক্ষের চারপাশে চোখ বুলালে যা দেখি তা হল, তিনটি চামড়া, এক কোণে কিছু ছাল, অন্য কোণে দুই কেজির মত গম। এ দৃশ্য দেখে কান্নায় ফেটে পড়ি। রাসূল জিজ্ঞাসা করলেন : কাঁদছ কেন ওমর? বললাম : কায়সার ও কিসরারতো দুনিয়ার ঐশ্বর্য রয়েছে, আর আপনি আলাহর রাসূল, আপনার এই অবস্থা? আমার কথা শুনে রাসূল বসে পড়লেন। বললেন : ওমর! তুমি কি চাওনা যে দুনিয়া ওদের হোক, আর পরকাল হোক আমাদের। আয়েশা রা. বলেন : দুই মাস চলে যেত কিন্তু রাসূলের বিবিদের বাড়িতে চুলা জ্বলত না। ওরওয়াহ রা. জিজ্ঞাসা করলেন, তাহলে আপনারা বাঁচতেন কী করে? তিনি বললেন : শুধু খেজুর ও পানি খেয়ে। মাঝে মধ্যে আনসারদের কেউ কেউ দুধও পাঠাতেন। আয়শা রা. থেকে অন্য এক বর্ণনা অনুসারে, রাসূলুলাহর সা. পরিবার কখনও টানা তিনদিন আটা খেতে পারেননি এবং এ অবস্থাতেই রাসূল দুনিয়া ত্যাগ করেছেন।

ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও রাসূলুলাহ সা. এ ধরনের জীবনযাপন করেছেন। তিনি যখন দুনিয়া ছেড়ে চলে যান তখন স্ত্রী-সন্তানদের জন্য কিছুই রেখে যাননি। না টাকা, না পয়সা, না উট, না ভেরা। বরং দুনিয়ার এক বিশাল রাষ্ট্রের যিনি প্রতিষ্ঠাতা, যিনি তাঁর জীবদ্দশাতেই জানতেন যে, তাঁর রাজত্ব এশিয়া আফ্রিকার সীমানা পেরিয়ে ইউরোপ পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। তিনি ঘোষণা দিলেন যে, আমরা নবী, আমাদের কেউ উত্তরাধিকারী হয় না। যা রেখে যাই তা হয় ছদকা (বুখারী ও মুসলিম)

لانورث ماتركنا صدقة

চরিত্র, কর্মকাণ্ড, ঐকান্তিকতা ও ত্যাগের যে ঝলক উপরে বর্ণিত হল, তা কোন সাময়িক বা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। বরং এ ধরনের ঘটনা প্রবাহেরই দ্বিতীয় নাম রাসূলের জীবন। তাঁর মানবতাবোধ এতই উন্নত ও অস্বাভাবিক ছিল যে, তিনি সৃষ্টি না হলে ইতিহাস লিখতে বাধ্য হতো যে, এই মাপের কোন মহামনীষী সৃষ্টি হয়নি এবং কখনও হবেও না। এই মাপের অসাধারণ ও শ্রেষ্ঠ মানবের বেলায় এটা কোন আশ্চর্য নয় যে, তিনি আলাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত পুরুষ হবেন। বরং তাঁকে রাসূল হিসেবে না মানাটাই হবে আশ্চর্যের কারণ। তাঁকে রাসূল মেনে নিলে আমরা তাঁর অলৌকিক ব্যক্তিত্বের একটা যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা খুঁজে পাই। পক্ষান্তরে যদি তাঁকে রাসূল মানতে অস্বীকার করি, তাহলে আমাদের কাছে এ প্রশ্নের অন্য কোন উত্তর থাকে না। কারণ, সমগ্র মানবেতিহাসে তাঁর তুল্য অন্য কেউ সৃষ্টি হয়নি। প্রফেসর স্মিথের নিম্নোক্ত বক্তব্যটি একদিকে এ বাস্তবতার পক্ষে একটি প্রকৃষ্ট স্বীকারোক্তি, অন্যদিকে রাসূলের রিসালাতের প্রতি ঈমান আনার একটি দ্ব্যর্থহীন আহবান। মুহাম্মদ সা. তাঁর জীবন

সায়াহ্নে ঠিক সে বিষয়েই তাঁর দাবি অক্ষুণ্ন রেখেছেন যা দিয়ে তাঁর মিশন শুরু করেছিলেন। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস ও সাহস প্রদর্শন করছি যে, উন্নততর দর্শন ও সত্যিকার খ্রিষ্টবাদ একদিন মেনে নিতে বাধ্য হবে যে তিনি একজন নবী ছিলেন।

রাসূলুলাহ সা. ওহী প্রাপ্তির সবচেয়ে বড় প্রমাণ হলো মহাগ্রন্থ আল-কুরআন। যা তিনি এই বলে পেশ করেছেন যে, ইহা আলাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এই পবিত্র বাণীসম্ভারই রাসূলুলাহর সা. ওহী প্রাপ্তি ও ইসলামের সত্যতা প্রমাণের জন্য যথেষ্ট। বিষয়টি যেহেতু ব্যাপক আলোচনার দাবিদার তাই পরবর্তী অধ্যায়ে এই মর্মে আলোকপাত করা হলো।

ওহীর বিজ্ঞানময়তা প্রমাণে পবিত্রগ্রন্থ আল কুরআন

রাসূলুলাহ সা. যখন দাবি করলেন যে, আল-কুরআন সত্য ও ন্যায়ের দিশারী হিসেবে অবতীর্ণ হয়েছে তখন অনেকে উন্নসিকতা দেখিয়ে উক্ত দাবি প্রত্যাখ্যান করল। তারা বলল, এ গ্রন্থ মানব রচিত, আলাহ প্রদত্ত নয়। এর জবাবে আল-কুরআনে বলা হলো, যদি তোমরা তোমাদের কথায় সত্যবাদী হও তাহলে কুরআনের মত আরেকটি গ্রন্থ প্রণয়ণ করে দেখাও।

أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٣﴾ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ ﴿٣٤﴾

তবে কি তারা বলে সে এটা লিখেছে আর তারা বিশ্বাস করে না, তাই যদি হয় তাহলে এর মত কোনো গ্রন্থ নিয়ে আসুক যদি তারা সত্যবাদী হয়। (তুর : ৩৩-৩৪)

সাথে সাথে আল-কুরআন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করল যে, ‘‘সমগ্র মানব ও জীনজাতি একত্রিত হয়ে যদি আল-কুরআনের মতো একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করতে চায় তাহলে তারা তা পারবে না, যদিও একে অন্যের সহযোগী হয়।

قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا

এখন প্রশ্ন হলো আল-কুরআনের কি সেই বৈশিষ্ট্য যার অনুকরণ করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। এর অনেক দিক রয়েছে তবে আমি এখানে শুধু একটি ব্যাপারে আলোকপাত করব যা আল কুরআনে এভাবে বর্ণিত হয়েছে–

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًاأَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا

এরা কি কুরআন নিয়ে চিন্তা করে না? যদি এটা আলাহ ব্যতীত অপর কারও পক্ষ থেকে হতো, তবে এতে অবশ্যই বহু বৈপরীত্য দেখতে পেত। [আন-নিসা : ৮২] উক্ত আয়াতে ‘‘ইখতিলাফ’’ শব্দের অর্থ বৈপরীত্য, অসংলগ্নতা, পার্থক্য ইত্যাদি। আর্থার আরবেরী বৈপরীত্যের অর্থ করেছেন। (inconsistency) অসামঞ্জস্যতা।

বক্তব্যে বৈপরীত্য না থাকা একটি দুর্লভ ব্যাপার, আলাহ ব্যতীত অন্য কারও পক্ষে এ ধরনের বক্তব্য পেশ সম্ভব নয়। বৈপরীত্যমুক্ত বক্তব্য উপস্থাপন করতে হলে অবশ্যই বক্তার জ্ঞান অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ পর্যন্ত পরিব্যপ্ত হতে হবে। মহা বিশ্বের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয় সম্পর্কে তাকে হতে হবে সুপরিজ্ঞাত। তার জ্ঞান হতে হবে সরাসরি, মাধ্যমবিহীন। উপরোক্ত তার মধ্যে এমন সব বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে সরাসরি, মাধ্যমবিহীন। তার মধ্যে এমন সব বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে যে, তিনি সকল প্রকার প্রভাব থেকে বিমুক্ত থেকে কোন জিনিসকে ঠিক সেভাবে দেখবেন, যেভাবে তা বাস্তবে রয়েছে।

এ অস্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যসমূহ কেবলমাত্র স্রষ্টার মধ্যেই পাওয়া যায়। কোন মানুষ কখনো এসব গুণাবলির অধিকারী হতে পারে না। এটাই হলো মূল কারণ, যার দরুন আলাহর পবিত্র বাণী সকল প্রকার বৈপরীত্য ও অসামঞ্জস্যতা থেকে বহু উর্ধ্বে। মানুষের মধ্যে এ ধরনের গুণাবলি নেই, তাই তার বাণী কখনো বৈপরীত্যমুক্ত হতে পারে না।

খোদায়ী বৈশিষ্ট্য

কথা ও বক্তব্যে বৈপরীত্য থাকা কোন অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। বৈপরীত্য মানব চিন্তার একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এ মহাবিশ্বের সৃষ্টিই এভাবে হয়েছে যে, এখানে স্রষ্টাকে বাদ রেখে সামঞ্জস্যপূর্ণ কোন মতাদর্শ সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। আলাহ ব্যতীত অন্য কোন ভিত্তির উপর নির্ভর করে যে মতাদর্শের গোড়াপত্তন হবে তা সাথে সাথে বৈপরীত্যের শিকার হতে বাধ্য। এ মহাবিশ্বের সামগ্রিক কাঠামোর

সঙ্গে তা কখানো খাপ খেতে পারে না। কোন মানুষের ব্রেইনপ্রসূত মতাদর্শের পক্ষে বৈপরীত্যমুক্ত হওয়া কখনই সম্ভব নয়। কয়েকটি উদাহরণের সাহায্যে ব্যাপারটি পরিস্কার করার চেষ্টা করা হলো।

অভিব্যক্তিবাদ **Evolutionism** এর একটি উদাহরণ জৈবিক অভিব্যক্তিবাদ। ডারউইন (১৮০৯-১৮৮৩) এবং অন্যান্য বিজ্ঞানীরা দেখতে পেলেন যে, পৃথিবী বক্ষে বিচরণরত জীবদের মাঝে বাহ্যিক পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও জৈবিক নীতিমালার ক্ষেত্রে একে অন্যের সঙ্গে যথেষ্ট মিল রাখে। উদারণস্বরূপ যদি ঘোড়ার কাঠামোকে সোজা দাঁড় করানো হয় তাহলে মানুষের আকৃতির সাথে অনেকটা সাদৃশ্য মনে হবে।

এ ধরনের পর্যবেক্ষণ থেকে তাঁরা এ থিউরি কায়েম করলেন যে, মানুষ পৃথক কোন প্রজাতি নয় বরং মানুষ এবং প্রাণী একই বংশের বিভিন্ন ধারা। বুকে ভর দিয়ে চলমান জীব, চুতস্পদ প্রাণী, বানর ইত্যাদি Evolutionism প্রক্রিয়ার পিছনের কড়ি, পক্ষান্তরে মানুষ হলো অগ্রবর্তী কড়ি। এ থিউরি একশত বছর পর্যন্ত মানুষের চিন্তাজগতকে প্রভাবিত করে রেখেছে। কিন্তু পরবর্তীকালে সম্পাদিত গবেষণা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মহাবিশ্বের সামগ্রিক কাঠামোর সাথে এ থিউরি আদৌ খাপ খায় না।

উদাহরণস্বরূপ, বৈজ্ঞানিক গবেষণার মাধ্যমে এটা আন্দাজ করা হয়েছে যে, পৃথিবীর বয়স প্রায় দুই হাজার মিলিয়ন বছর। এ সময়সীমা ডারউইনের Evolutionism প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রজাতিসমূহের উন্মেষ ও বিবর্তনের জন্য কিছুতেই যথেষ্ট নয়। বিজ্ঞানীরা হিসাব করে দেখেছেন যে, একটি অতি সামান্য প্রোটিনী অঙ্গের Evolutionism প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি হতে কোটি কোটি মিলিয়ন বছরের প্রয়োজন। অতঃপর মাত্র দুই হাজার মিলিয়ন বছরে পৃথিবী বক্ষে দশ লক্ষাধিক পূর্ণাঙ্গ শরীরবিশিষ্ট জন্তু-জানোয়ার ও দুই লক্ষ বৃক্ষলতার অস্তিত্বে আসা কী করে সম্ভব। দুই হাজার মিলিয়নের এই সীমিত সময়োতো একটি সামান্য প্রাণীও সৃষ্টি হতে পারে না। সেখানে অভিব্যক্তির অসংখ্য পর্যায় পেরিয়ে মানুষের মতো উন্নত প্রজাতির সৃষ্টির কথাতো কল্পনাই করা যায় না।

অভিব্যক্তিবাদ জৈব প্রক্রিয়ায় যে ধরণগত পরিবর্তনের দাবি করে এ ব্যাপারে গণিতবিদ patau অংক কষে দেখছেন। তাঁর ক্যালকুলেশন অনুসারে যে কোন প্রজাতিতে অতি সামান্য পরিবর্তন আসতে হলে দশ লক্ষ ট্রিলিয়ন সময়ের প্রয়োজন। এই সমস্যার সমাধান কল্পে pandpermia নামক থিউরি উপস্থান করা হয়। এ থিউরি অনুসারে মহাশূন্যের কোথাও প্রথমে জীবনের সৃষ্টি হয়েছে এবং সেখান থেকে সফর করে তা পৃথিবীতে এসেছে। কিন্তু বিবেচনা করে দেখা গেল যে এ থিউরি মেনে নেয়ার পথে আরো বড় বড় বাঁধা দাঁড়িয়ে আছে। কারণ, এ পৃথিবী ব্যতীত মহাবিশ্বে এমন কোন গ্রহের সন্ধান পাওয়া যায়নি যেখানে জীবনের উন্মেষ ও বিকাশ লাভের উপযুক্ত পরিবেশ রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, পানি যা জীবনের প্রকাশ ও স্থায়িত্বের জন্য অতি প্রয়োজন, তা এ পৃথিবী ব্যতীত অন্য কোথাও পাওয়া যায়নি। এ থিউরি ও যখন প্রয়োগ করা সম্ভব হলো না তখন বিজ্ঞানীদের কয়েকজন (Emergent Evolution) আকস্মাৎ অভিব্যক্তির থিউরি উপস্থাপন করলেন। এ থিউরি অনুসারে ধারণা করা হলো যে, জীবন ও তার প্রকারসমূহ অকস্মাৎ সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু এ যে কেবল কাগুজে লিপি, এটা কোন বৈজ্ঞানিক মতবাদ নয়। অকস্মাৎ সৃষ্টি কখনো পদার্থের অন্ধ নিয়মানুসারে হওয়া সম্ভব নয়। অকস্মাৎ সৃষ্টির পেছনে অবশ্যই একজন হস্তক্ষেপকারী প্রয়োজন। অর্থাৎ, ওই অতিপ্রাকৃতিক হস্তক্ষেপকারীকেই পরিশেষে মানতে হয় যাকে অস্বীকার করার জন্য এতসব থিউরি উপস্থাপন করা হচ্ছে।

আসলে এ বিশ্বভূখণ্ডের সৃষ্টিকলা বুঝতে হলে স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাস করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

মানুষের অজ্ঞতা

Encyclopaedia of Ignorance (অজ্ঞতার বিশ্বকোষ) নামে লন্ডন থেকে একটি বই প্রকাশিত হয়েছে। উক্ত বিশ্বকোষে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার বড় বড় বিদ্যান ব্যক্তিগণ অংশগ্রহণ করেছেন। এ গ্রন্থের পরিচিতিতে বলা হয়েছে যে, বিশ্ববরেণ্য ষাটজন বিজ্ঞানী, বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় জরিপ চালিয়ে দেখিয়েছেন, কোন কোন ক্ষেত্রে আমাদের জ্ঞানের বড় ধরনের শূন্যতা রয়েছে।

In the Encyclopedia of Ignorance some so well-known scientists survy different fields of research, trying to point out signifcant gaps in our knowledge of the world.

মহাবিশ্বের স্রষ্টা পৃথিবীটা এমনভাবেই বানিয়েছেন যে, কোন যান্ত্রিক ব্যাখ্যা বিশেষনের মাধ্যমে এর অবকাঠামোকে বুঝা কিছুতেই সম্ভব নয়।

উদাহরণস্বরূপ প্রফেসর জন মিনার্ড স্মিথ অভিব্যক্তিবাদ-কে Built-in problems (যার ভিতেই রয়েছে সমস্যা) বলে আখ্যায়িত করেছেন। কারণ, আমাদের থিউরি রয়েছে কিন্তু বাস্তবতার নিরিখে পরখ করে দেখে তার সত্যতা যাচাইয়ের কোন মাধ্যম ব্যবস্থা আমাদের হতে নেই।

আল কুরআন অনুসারে মানুষ এবং অন্যান্য প্রজাতিসমূহ সুমহান স্রষ্টা আলাহ তালার সৃষ্টি। পক্ষান্তরে অভিব্যক্তিবাদ Evolutionism অনুসারে সকল প্রকার জীবনের বিকাশ অন্ধ বস্তুতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ঘটেছে। সৃষ্টিতত্ত্বের কোরানিক থিউরি ব্যাখ্যা বিশেষণের কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। কারণ, আলাহপাক নিরঙ্কুশ ইচ্ছার অধিকারী এক সত্ত্বা। তার কোন বস্তু কেন্দ্রিক মাধ্যমের প্রয়োজন হয় না। তিনি তাঁর একান্ত ইচ্ছায় যে কোন জিনিসকে অস্তিত্ব প্রদান করতে পারেন। এর বিপরীতে অভিব্যক্তি প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে প্রতিটি ঘটনার পেছনে একটি বস্তুকেন্দ্রিক কারণের উপস্থিতি অত্যাবশ্যকীয়। আর যেহেতু ঐ কারণসমূহ আবিষ্কার করা সম্ভব হয়নি, সে জন্য অভিব্যক্তিবাদ ব্যাখ্যাবিহীনই থেকে গেছে। অভিব্যক্তিবাদ বৈজ্ঞানিক যুক্তিশূন্যতায় ভুগছে। পক্ষান্তরে কুরআনিক থিউরির পেছনে সহজবোধ্য যুক্তি রয়েছে।

রাজনীতি বিজ্ঞান

রাজনীতি বিজ্ঞানের ব্যাপারটাও ঠিক একই রকম। এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকার (১৯৮৪) প্রবন্ধকারের ভাষায় : রাজনৈতিক দর্শন ও রাজনৈতিক বাদানুবাদ মূলত একটি কেন্দ্রকে লক্ষ্য করে ঘূর্ণায়মান থেকেছে আর তা হল কে কার উপর কর্তৃত্ব করবে—

political philosophy and political conflict have revolved basically around who should have power over whom (14/1697)

বিগত পাঁচ হাজার বছরে এক্ষেত্রে অনেক শক্তিশালী মেধার প্রচেষ্টা ব্যয় হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আজো পর্যন্ত রাজনীতি-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এমন সামঞ্জস্যপূর্ণ নীতিমালা আবিস্কার হয়নি যাকে দার্শনিক ইস্পেনোজা Scientific base বৈজ্ঞানিক বুনিয়াদ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

রাজনীতি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এক ডজনের বেশী School of thinking পাওয়া যায় যে গুলোকে আমরা বড় দুইটি গ্রুপে ভাগ করতে পারি। এক, একনায়কতন্ত্র, দুই. গণতন্ত্র। এ দুইটির প্রত্যেকটিই কঠিন প্রশ্নের সম্মুখীন। একনায়কতন্ত্রবাদের বিপক্ষে প্রশ্ন করা হয় যে, একজন মানুষের উপর অন্য আরেকজন কেন ক্ষমতাবান হয়ে তার উপর কর্তৃত্ব চালাবে? আর এ জন্য তা ব্যাপকভাবে গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি। দ্বিতীয়টি হল গণতন্ত্র তথা গণক্ষমতা ও গণকর্তৃত্বের মতবাদ। যদিও এ দ্বিতীয় মতবাদটি গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে কিন্তু মতাদর্শিক দৃষ্টিকোণ থেকে এর বিপক্ষে অনেক অভিযোগ রয়েছে। গণতন্ত্রের (Democracy) আদর্শিক ভিত্তি হল এই যে, সমস্ত মানুষ স্বাধীন ও সবার অধিকার সমান। রুশোর গ্রন্থ (Social Contract) এর প্রথম প্যারাগ্রাফটি এভাবে শুরু হয়েছে :

মানুষ স্বাধীন হয়ে জন্ম নিয়েছে। কিন্তু আমি তাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ দেখতে পাচ্ছি। Democracy , একটি গ্রিক শব্দ যার অর্থ হল গণশাসন কিন্তু বাস্তবিক অর্থে সকল মানুষের শাসন ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হবে এটা অসম্ভব। সবাই সবার উপর শাসন করবে, এটা কি করে সম্ভব। উপরন্তু মানুষকে সামাজিক জীব বলে আখ্যায়িত করা হয়। মানুষ ও পৃথিবীতে একা থাকে না যে, সে যেভাবে ইচ্ছে সেভাবেই জীবনযাপন করবে। বরং একজন মানুষ সমাজের অন্যান্য মানুষের সাথে জড়িত। মানুষ একটি সমাজে জন্ম নেয়। সমাজ তার উপর রকমারী বিধি নিষেধ চাপিয়ে দেয়।

যখন সকল জনতা একই সাথে শাসন পরিচালনা করতে সক্ষম নয় তাহলে গণশাসন পদ্ধতি কীভাবে কার্যকর করা সম্ভব হতে পারে, এ ব্যাপারে বিভিন্ন তত্ত্ব পেশ করা হয়েছে। তন্মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ হলো রুশো কর্তৃক উপস্থাপিত তত্ত্ব। রুশো তার তত্ত্বকে গণঅভিমতের (General will) বুনিয়াদের উপর দাঁড় করিয়েছে। এই গণঅভিমত নির্বাচন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। এভাবে গণশাসন

মূলত জনগণ কর্তৃক নিবাচিত ব্যক্তিবর্গের শাসনে পরিণত হয়। ভোট প্রয়োগের সময় জনগণের স্বাধীনতা অনেকাংশেই থাকে তবে ভোট দেয়ার পর জনগণকে নিজেদের মতোই কিছু ব্যক্তিবর্গের শাসিতে পরিণত হতে হয়। রুশো, এর উত্তর দিতে গিয়ে বলেছেন, কোন ব্যক্তির খেয়াল-খুশির অনুসরণ করা গোলামী, কিন্তু খোদ ব্যক্তির প্রণীত আইনের অনুসরণ করা স্বাধীনতা।

To follow one's impulse is slavery but to obey the self-prescribed law is liberty (15/1172)

এ উত্তরটি কিছুতেই সন্তোষজনক নয়। সুতরাং, এ তত্ত্বটি কঠিন প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছে। কারণ জনগণ প্রত্যক্ষ করল যে, নান্দনিক শব্দের সমাহার থাকা সত্ত্বেও নির্বাচন পদ্ধতির মাধ্যমে গণতন্ত্রচর্চা মূলত নির্বাচিত রাজত্ব প্রথারই নামান্তর। নির্বাচনের পর গণতন্ত্রী ব্যক্তিবর্গ ঠিক একই প্রকৃতির বনে যান, যেমনটি ছিলেন আগেকার রাজা বাদশাহগণ।

এভাবে সকল রাজনৈতিক চিন্তাবিদগণ তাত্ত্বিক অস্পষ্টতা ও বৈপরীত্যে ভুগছেন যা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার কোনো পথ আপতদৃষ্টিতে পরিলক্ষিত হচ্ছে না।

বিশ্বাসের দিক থেকে মানুষে মানুষে সাম্যতা সবার কাছেই সর্বোচ্চ মানবিক গুণ হিসেবে স্বীকৃত। কিন্তু মানুষের এ সাম্যতা সত্যিকার অর্থে না রাজতন্ত্রের মাধ্যমে অর্জন করা সম্ভব হয়েছে, না সম্ভব হচ্ছে প্রচলিত গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে। রাজতন্ত্র যদি বিশেষ একটি পরিবারের শাসন হয়ে থাকে তাহলে গণতন্ত্র নির্বাচিত ব্যক্তিবর্গের রাজত্ব বৈ অন্য কিছু নয়। তবে যখন রাজপরিবারের শাসন অবলুপ্ত হয়েছে তখন জনতার সামনে শুধু একটাই সুযোগ ছিল। তাহলো নির্বাচিত ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক শাসিত হওয়ার উপর নিজেদেরকে রাজি করে নেয়া। রাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, নতুন শাসকগোষ্ঠী নিজেদেরকে জনগনের প্রতিনিধি বলে ঘোষণা দেয়। পক্ষান্তরে আগেকার শাসকগণ নিজেদেরকে আলাহর প্রতিনিধি Representative of God on Earth

এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার প্রবন্ধকার এক্ষেত্রে মানুষের ব্যর্থতার খোলাসা এভাবে ব্যক্ত করেছেন যে The history of political philosophy from Plato until the present day makes plain that modern political philosphy is still faced with the basic problems (14/695)

রাজনৈতিক দর্শনের ইতিহাস, পেটো থেকে আজ পর্যন্ত এটাই প্রমাণ করছে যে, নয়া রাজনৈতিক দর্শন এখনো কিছু জটিল ও মৌলিক সমস্যায় জর্জরিত, রাজতন্ত্র অথবা গণতন্ত্র উভয়টাতেই সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকার কিছু মানুষের হাতে ন্যস্ত করা হয়। এ হিসেবে উভয় পদ্ধতিই মানুষে মানুষে সমতার আদর্শের বিপরীতে গিয়ে দাঁড়ায়। গণতন্ত্র, মূলত মানুষে মানুষে সাম্যতা প্রতিষ্ঠার নামেই পেশ করা হয়েছে। কিন্তু নিজের অভ্যন্তরীণ বৈপরীত্যের কারণে তা কেবল উল্টা ফলাফলই উৎপাদন করেছে। আসলে এ পৃথিবীতে কেবল একটাই রাজনৈতিক দর্শন রয়েছে যা তাত্ত্বিক বৈপরীত্য থেকে সম্পূর্ণমুক্ত, আর তা হলো আল-কুরআনের রাজনৈতিক দর্শন। আল কুরআন বিশ্বপ্রতিপালক আলাহর শাসনকর্তা হওয়ার থিউরি পেশ করে-

يقولون هل لنا من الأمر من شيئ . قل إن الأمر كله لله

তারা বলে-আমাদের কি কোনো ব্যাপারে হিস্সা রয়েছে, বল সমস্ত কিছুই আলাহর।

এ থিউরি তাত্ত্বিক বৈপরীত্য থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। কারণ, এ থিউরি অনুসারে যখন আলাহই একমাত্র শাসক এবং সকল মানুষ শাসিত, তখন সবাই একই কাতারে গিয়ে দাঁড়ায়। কারণ, সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব মানুষের গণ্ডির বাইরে এক মহাসত্যের হাতে তুলে দেয়ায় মানবিক পরিমণ্ডলে শাসক আর শাসিতের কোন প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু রাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রে এ কর্তৃত্ব একটি গোষ্ঠীর হাতে থাকায় মানুষে মানুষে সমতা কক্ষনো কায়েম সম্ভব হয় না।

আলাহর শাসকত্বের থিউরি একটা পূর্ণঙ্গ, সমন্বিত ও বৈপরীত্যমুক্ত ধারণা পেশ করে। পক্ষান্তরে মানুষের শাসকত্বের নীতির আওতায় এমন কোনো থিউরি তৈরি করা আদৌ সম্ভব হয় না, যা বৈপরীত্য থেকে হতে পারে পবিত্র।

সকল রাজনৈতিক থিউরির চেষ্টা ও কামনা এটাই ছিল যে, মানুষের মাঝে শাসক ও শাসিতের ভেদাভেদ শেষ করে কীভাবে সমতা কায়েম করা যায়। কিন্তু মানুষের শাসকত্বের পরিমণ্ডলে এ ভাগ-বন্টন কখনই শেষ হয় না। বরং এ অবস্থা সব সময়ই বিরাজমান থাকবে যে, মানুষের মধ্যে একাংশ

এ নামে অথবা সেনামে শাসক বনে কর্তৃত্ব চালিয়ে যাবে আর অন্যরা শাসিতের অবস্থান মেনে নিতে বাধ্য হবে। কিন্তু যখন আলাহকে শাসক হিসেবে মেনে নেয়া হয় তখন এই ভেদাভেদ অবলুপ্ত হয়। এবার একদিকে থাকেন বিশ্বপ্রতিপালক আলাহ, অন্যদিকে সমগ্র মানবগোষ্ঠী। এবার শাসক ও শাসিতের বিভেদ কেবল আলাহ ও বান্দার মাঝে সীমিত হয়ে যায়। মানুষে মানুষে রাজনৈতিক অবস্থানগত দিক থেকে আর কোনই পার্থক্য থাকে না।

আসল কথা হলো মানব সমাজে শাসক ও শাসিতের ব্যবধান শেষ করতে চাইলে একমাত্র উপায় হলো, আলাহকে প্রকৃত বাদশাহ মেনে নিয়ে তাঁর কর্তৃত্বের অধীনে নিজেদেরকে সঁপে দেয়া। এটাই হলো একমাত্র রাজনৈতিক থিউরি যা তাত্ত্বিক বৈপরীত্য থেকে পবিত্র। এছাড়া এতৎসংক্রন্ত অন্য-কোনো থিউরিই বৈপরীত্য থেকে মুক্ত হতে পারে না।

দুই প্রকার বৈপরীত্য

সুরা আন-নিসার উলিখিত আয়াতে যে বৈপরীত্যের কথা বলা হয়েছে তার বিশেষ দুইটি দিক রয়েছে। একটি অভ্যন্তরীণ, অন্যটি বাহ্যিক।

অভ্যন্তরীণ বৈপরীত্য বলতে বুঝায় গ্রন্থের একাংশ অন্য অংশের অথবা এক বর্ণনা অন্য বর্ণনার বিপরীতে দাঁড়ানো। আর বাহ্যিক বৈপরীত্য বলতে বুঝায় গ্রন্থে উলিখিত কোন বর্ণনা বহির্বিশ্বের কোন ঘটনার বিপরীতে অবস্থান নেয়া। আল–কুরআন দাবি করে যে, এই উভয় প্রকার বৈপরীত্য থেকে সে সম্পূর্ণ পবিত্র। পক্ষান্তরে মানুষের কোনো সাহিত্যকর্মই এই উভয়বিদ বৈপরীত্য থেকে মুক্ত হতে পারে না। এটা গিরি শিখরে উদ্ভাসিত মধ্যাহ্নের সূর্যের মতোই সুস্পষ্ট যে, আল-কুরআন মানুষের ব্রেইনপ্রসূত সাহিত্যকর্ম নয়। বরং এক মহা শক্তিধর বিশ্ব প্রতিপালকের প্রত্যাদেশ বা ওহী। যদি আল-কুরআন ওহী না হয়ে কোনো মানুষের সাহিত্যকর্ম হতো তাহলে এর মধ্যেও ঐ সকল অসম্পূর্ণতা পুরো মাত্রায় থাকতো যা সকল মানুষের সৃষ্টিকর্মেই একচেটিয়াভাবে পাওয়া যায়।

অভ্যন্তরীণ বৈপরীত্য

কোনো বাণীতে অভ্যন্তরীণ বৈপরীত্য থাকা মূলত অভ্যন্তরীণ অপূর্ণতারই ফলাফল। অভ্যন্তরীণ বৈপরীত্য থেকে বাঁচার জন্য দুটি জিনিসের উপস্থিতি অত্যাবশ্যকীয়। ১. পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান, ২. বস্তুনিষ্ঠতা। আর কোনো মানুষের পক্ষেই এ দুই প্রকার ঘাটতি থেকে মুক্ত হওয়া কখনো সম্ভব নয়। এ জন্যই মানুষের কোনো কথা ও বর্ণনা অভ্যন্তরীণ বৈপরীত্য থেকে মুক্ত হতে পারে না। বিশ্বপতিপালক একমাত্র আলাহই সকল অপূর্ণতা থেকে পবিত্র। এ কারণেই শুধু আলাহর পবিত্র বাণীই অভ্যন্তরীণ অপূর্ণতা থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত।

মানুষ তার সীমাবদ্ধতার কারণে বহু বিষয়কে তার মেধা ও বুদ্ধির আওতায় আনতে সমর্থ নয়। এ কারণে সে তার বিচার বুদ্ধির আলোকে কখনো একপ্রকার বক্তব্য দেয় আবার কখনো অন্য প্রকার। মানুষের বয়স সংক্ষিপ্ত ও নাতিদীর্ঘ। মানুষের জানা ও জ্ঞানার্জনের পর্ব শেষ হওয়ার বহুপূর্বে মৃত্যুর কঠিন থাবা তার সকল কার্যকারিতার অবলুপ্তি ঘটায়। মানুষ তার অপক্ক জ্ঞানের ভঙ্গুর ভিতের উপর দাঁড়িয়ে এমন কথা বলে, যা পরবর্তীতে বাস্তববিরুদ্ধ বলে প্রমাণিত হয়।

মানুষের কখনো কারো সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক হয় আবার কারো সাথে শত্রুতার। কারো সাথে প্রেম–ভালোবাসার আবার কারো সথে ঘৃণা ও অবজ্ঞার। কারো ব্যাপারে সুস্থমস্তিষ্কে মন্তব্য করতে প্রয়াস পায়, আবার কারো বেলায় প্রতিক্রিয়াশীল মানসিকতার শিকার হয়। মানুষের উপর কখনো চিন্তা ও উৎকণ্ঠার মুর্হূত অতিক্রান্ত হয়। আবার কখনো আনন্দ-উলাসের। মানুষের ভাবজগৎ কখনো এক প্রকার থাকে আবার কখনো অন্য প্রকার। এ সব কারণে মানুষের চিন্তাচেতনা বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হয়। তাইতো সে কখনো এক রকম কথা বলে, আবার কখনো অন্য রকম।

আলাহপাক এ ধরনের সকল অপূর্ণতা থেকে পবিত্র। এ জন্য তার বাণী সম্ভারেও রয়েছে কল্পনাতীত ঐক্য সামঞ্জস্যতা।

নবী ঈসার ব্যক্তিত্ব

উদাহরণ স্বরূপ বাইবেল এর কথা থরা যাক। বাইবেল প্রথমে প্রত্যাদিষ্ট ঐশী বাণী ছিল এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু পরবর্তীতে মানব রচনার সংমিশ্রণ ঘটায় বাইবেল তার স্বচ্ছতা হারায় এবং এতে বেশ কিছু অন্তর্সংঘাতের সৃষ্টি হয়। বাইবেলের যে অংশকে নতুন সুসমাচার (New testament) বলা হয় এতে ঈমা আ. এর বংশ পরিক্রমার বর্ণনা রয়েছে। এই বংশ পরিক্রমা মেথিউ- এর

গস্প্যালে এভাবে শুরু হয়, ঈসা মসিও পিতা দাউদ পিতা আব্রাহাম। এটা সংক্ষিপ্ত বংশ পরিক্রমা। এরপর গস্প্যালে বিস্তারিত বংশপরিক্রমা উলিখিত হয়েছে যার শুরুতে হলেন ইব্রাহিম আঃ এবং শেষে ইউছুফ নামের জনৈক ব্যক্তি যিনি, বাইবেলের বর্ণানাসুসারে মারয়ামের স্বামী ছিলেন, যার গর্ভে ঈসার জন্ম।

এরপর পাঠক মার্কের গস্প্যাল পড়তে শুরু করলে ঈসার বংশপরিক্রমায় দেখতে পায় :

ঈসা মসিও পিতা ঈশ্বর

এর অর্থ এ দাঁড়ায় যে, বাইবেলের এক অধ্যায় অনুসারে মাসিহ ইউছুফ নামী এক ব্যক্তির সন্তান, আবার একই বাইবেলের অন্য অধ্যায় অনুসারে খোদার সন্তান।

বাইবেল, শুরুতে নিঃসন্দেহে স্রষ্টার বাণী ছিল ও সকল প্রকার সংঘাত ও বৈপরীত্য থেকে পবিত্র ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে এতে মানুষের বাণীর সংমিশ্রণ ঘটেছে, ফলে এর বক্তব্যসমূহে সৃষ্টি হয়েছে পরস্পর বিরোধিতা ও সংঘাত। বাইবেলের এই অন্তর্সংঘাতের ব্যাপারে চার্চের পক্ষ থেকে এক আশ্চর্য রকমের ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়। এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা অনুসারে উলিখিত ইউছুফ এর ব্যাপারে নিম্নোক্ত বক্তব্য দেখতে পাওয়া যায়।

Christ earthy father, the virgin Mary's husband.

যিশুখ্রিষ্টের নৈসর্গিক পিতা, কুমারী মারয়ামের স্বামী।

কার্ল মার্ক্সের চিন্তায় অন্তর্সংঘাত

এই ছিল ধর্মীয় বাণীতে অন্তর্সঘাতের উদাহরণ। এবার অন্যান্য বাণীতে অন্তর্সঘাতের উদাহরণ নিন। এক্ষেত্রে আমি কার্ল মার্ক্সের উদ্ধৃতি দেব। বর্তমান যুগে মার্ক্সের মেধাগত বড়োত্বের অবস্থা এই যে, প্রফেসর john Kenneth galbraith মার্ক্সের কথা উলেখ করে বলেন- If we agree that the Bible is a work of collective authorship, only Mohammad rivals Marx in the number of professed and devoted followers recruited by a single author, and the competition is not really very close. the followers of Marx now far outnumber the son of prophet.

[john Kenneth galbraith, the age of uncertainty, British Broadcasting Corporation, 35 Marylebone high street, London, p-77]

"আমরা যদি মেনে নিই যে, বাইবেল কয়েকজন লেখকের সম্মিলিত কর্ম তাহলে অনুরক্ত ভক্ত ও অনুসারীদের সংখ্যার দিক থেকে একমাত্র মুহাম্মদই হবে মার্ক্সের প্রতিদ্বন্দ্বি একক গ্রন্থকার। তবে প্রতিদ্বন্দ্বিতাটা বাস্তবে বেশি কাছাকাছি নয়। কারণ, মার্ক্সের অনুসারীদের সংখ্যা নবী মুহাম্মদের অনুসারীদের তুলনায় বেড়ে গিয়েছে।"

কিন্তু মার্ক্সের এই সুবিস্তৃত জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও কঠিন বাস্তবতা হলো এই যে, মার্ক্সের বাণীসম্ভার অন্ত র্সঘাতে ভরপুর। মার্ক্সের চিন্তায় এতো বেশি অন্তর্বৈপরীত্য যে, মার্ক্স সৃষ্ট রচনা সম্ভারকে অন্তর্সংঘাতময় বাণীসমগ্র বললে ভুল হবে না।

উদাহরণস্বরূপ মার্ক্স বলেছেন- এ পৃথিবীতে সকল কুকীর্তি ও অশুভ কর্মের মূলে রয়েছে সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর উপস্থিতি। এ শ্রেণীসমূহ তার মতানুসারে, ব্যক্তিমালিকানা পদ্ধতি থাকার ফলেই সৃষ্টি হয়েছে। সমাজের এক শ্রেণী তথা বুর্জোয়া শ্রেণী উৎপাদনের সকল মাধ্যমসমূহ কুক্ষিগত করে মেহনতী জনতাকে লুটে নেয়, স্বর্বসান্ত করে ফেলে।

এ সমস্যার সমাধানের ব্যাপারে মার্ক্সের মন্তব্য হলো পুঁজিপতি শ্রেণীর কাছ থেকে সম্পদের মালিকানা ছিনিয়ে এনে মজদুর শ্রেণীর করায়ত্বে দিয়ে দিতে হবে। এই কার্যক্রমকে তিনি শ্রেণীশূন্য সমাজ প্রতিষ্ঠা বলে আখ্যায়িত করেছেন। কিন্তু এটা একটা পরিস্কার অন্তর্সংঘাতময় বক্তব্য। কারণ, উলিখিত কার্যক্রমের দ্বারা যে জিনিসটি অস্তিত্ব লাভ করবে তা শ্রেণীশূন্য সমাজ নয় বরং উৎপাদনের কলকজার উপর থেকে একশ্রেণীর কর্তৃত্ব খতম হয়ে অন্য শ্রেণীর কর্তৃত্ব কায়েম হবে। এটা শ্রেণীর অবলুপ্তি নয় বরং কেবল হাত বদল। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, প্রথমে এ কর্তৃত্ব মালিকানার নামে চলত, আর এখন তা চলবে ব্যবস্থাপনার নামে।

যে বিষয়টিকে মার্ক্স শ্রেণীমুক্ত সমাজ বলেছেন সেটা মূলত পুঁজিপতিদের মালিকানার বদলে কমিউনিস্ট শ্রেণীর মালিকানা বিশিষ্ট সমাজ ব্যতীত অন্য কিছু নয়।

মার্ক্স একই জিনিসকে এক স্থানে ভালো বলেন অন্য স্থানে খারাপ। তবে ধনাঢ্যদের বিরুদ্ধে বর্ণনাতীত ঘৃণা ও কঠোর মনোভাবের কারণে তিনি তার চিন্তার এই অন্তর্সংঘাতকে আঁচ করতে পরেননি। তিনি উৎপাদনের মাধ্যমসমূহের কর্তৃত্ব একশ্রেণীর হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে অন্য শ্রেণীর হাতে দিচ্ছিলেন। কিন্তু উগ্রবাদী মানসিকতার কারণে এই বৈপরীত্যকে অনুভব করতে পারেননি বরং একই প্রকৃতির দুটি ঘটনার একটিকে বলেছেন লুণ্ঠন অন্যটি কলেছেন সামাজিক ব্যবস্থাপনা।
আল-কুরআন এ ধরনের অন্তর্সংঘাত থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র। আল-কুরআনের একটি বর্ণনা অন্যটির সাথে কখনোই সংঘাতে আসে না। গোটা আল-কুরআনে বর্ণিত বাণীসম্ভার পরস্পর সমর্থক ও একই সুতোয় গাথা। এ বিষয়টি আল–কুরআনের ঐশী উৎস তথা ওহীর সত্যতা প্রমাণের ক্ষেত্রে একটা বলিষ্ঠ দলিল।
অপ্রাসংগিক উদাহরণ
আল-কুরআনের বিরুদ্ধাচারণকারীরা এক্ষেত্রে কিছু উদাহরণ দিয়ে আল–কুরআনের অন্তর্সংঘাত প্রমাণ করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু এ সকল উদাহরণের সবগুলোই অপ্রাসংগিক। একটু মনোযোগ দিয়ে দেখলেই ব্যাপারটা পরিস্কার হয়ে যাবে। উদাহরণস্বরূপ বলা হয় যে, আল-কুরআনে একদিকে বলা হয়েছে, সকল মানুষই সমান। এরশাদ হয়েছে– হে লোকসকল, তোমাদের প্রভুকে ভয় করো তিনি তোমাদের এক আত্মা থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং সেই আত্মা থেকেই তার জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং তা থেকে বহু নরনারী ছড়িয়ে দিয়েছেন। সুরা নিসাঃ ১ বিদায় হজ্জের ভাষণে সকল মানুষের সমতার কথা কথা উলেখ করে বলা হয়েছে, "মানুষ আদম থেকে আর আদম মাটি থেকে।"
এ নীতি অনুসারে নারী ও পরুষের মাঝে কোনই পার্থক্য নেই। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। একদিকে আল-কুরআন সাম্যবাদের কথা বলে অন্যদিকে নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক দৃষ্টিতে দেখে। কারণ, সাক্ষী প্রদানের ক্ষেত্রে দুইজন নারীকে একজন পুরুষের সমান বলা হয়েছে।
এটা একটা নির্ঘাত ভুল ধারণা। এটা ঠিক যে, দুইজন মহিলার সাক্ষী এক জন পুরুষের সাক্ষীর সমান সাব্যস্ত করা হয়েছে, তবে এর ভিত্তি নারী-পুরুষে শ্রেণীগত বৈষম্য সৃষ্টি করা নয়। বরং এর প্রকৃত কারণ অন্য খানে। এ নির্দেশটি আল–কুরআনের যে আয়াতে এসেছে সেখানেই এর কারণ বর্ণনা করে বলা হয়েছে-
"যখন তোমরা ঋণসংক্রান্ত লেনদেন করবে তখন তা লেখার ব্যবস্থা করো এবং তোমাদের পুরুষদের মধ্যে দুইজন পুরুষকে সাক্ষী রাখো, আর যদি দুইজন পুরুষ না পাওয়া যায় তাহলে একজন পুরুষ দুইজন মহিলা, যাদের তোমরা পছন্দ কর তাদের মধ্য থেকে। যাতে ঐ দুই মহিলার মধ্যে যদি কেউ ভুলে যায় তাহলে অন্যজন স্মরণ করিয়ে দিবে। [আল বাকারা : ২৮২]
وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى البقرة : ٢٨٢

এ আয়াতের শব্দগুলো অত্যন্ত পরিষ্কারভাবেই ব্যক্ত করছে যে, এ নির্দেশের ভিত্তি নারী ও পুরুষে জাতিগত পার্থক্য নয় বরং স্মরণ থাকা ও না থাকার ভিত্তিতে এ নির্দেশ জারি হয়েছে। এ আয়তটি জীবনের একটি কঠিন বাস্তবতার দিকে ইঙ্গিত করছে যে, নারীর স্মরণশক্তি সাধারনভাবে পুরুষের তুলনায় কম। এজন্য ঋণসংক্রান্ত ব্যাপারে সাক্ষীর ক্ষেত্রে একজন পুরুষের স্থলে দুইজন মহিলার সাক্ষী গ্রহণযোগ্য হবে। যাতে সাক্ষী দেয়ার প্রয়োজন হলে উভয়ে মিলে একে অন্যের স্মরণ প্রক্রিয়ায় সহায়তা করতে পারে।
এখানে আমি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, আধুনিক গবেষণা ও তত্ত্বানুসন্ধান এ বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছে যে, নারীর স্মরণশক্তি তুলনামূলকভাবে পুরুষের চেয়ে দুর্বল। রাশিয়ায় এ ব্যাপারে রীতিমত বৈজ্ঞানিক গবেষণা হয়েছে এবং তার ফলাফল গ্রন্থাকারে ছাপিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে। এ গবেষণার সংক্ষিপ্ত বিবরণী পত্র পত্রিকাতেও প্রচারিত হয়েছে। নয়া দিলী থেকে প্রকাশিত টাইমস অব ইন্ডিয়া ১৮ জানুয়ারি ১৯৮৫ এই মর্মে রির্পোট করতে গিয়ে বলেছে :
Memorising ability : Men have a greater ability to memorise and process mathematical information than woman but females are better with words, a Soviet scientist says, reports UPI Men dominate mathematical subjects

due to the peculiarities of their memory. Dr Vladimir knonovalov told the Toss news agency

গণিতিক তথ্য স্মরণ ও প্রসেসিং এর ক্ষমতা নারীর তুলনায় পুরুষেরই বেশি। তবে শব্দের ক্ষেত্রে নারীই উত্তম। জনৈক রাশিয়ান বিজ্ঞানী এ কথা বলেন। ড. বাদিমির কোনলোভ টাস এজেন্সিকে বলেন যে, স্মরণশক্তির বিশেষ গুণাগুণ হেতু গাণিতিক বিষয়ের উপর পুরুষরাই আধিপত্য বিস্তার করে আছে। এটা যদি জীবনের একটা কঠিন বাস্তবতা হয়ে থাকে যে, নারীর স্মরণশক্তি পুরুষের তুলনায় কম, তাহলে এটা বিজ্ঞান সমর্থিত কথা হবে যে, সাক্ষী সংক্রন্ত ব্যাপারে দুইজন মহিলাকে একজন পুরুষের জায়গায় দাঁড় করানো হবে। আল-কুরআনের উলিখিত বাণী আল-কুরআনের কোনো অন্ত র্সংঘাতের ইঙ্গিত বহন করছে না। বরং এটাই প্রমাণ করছে যে, আল কুরআন এমন এক স্রষ্টার প্রত্যাদিষ্ট বাণী যিনি সকল বাস্তবতা সম্পর্কে সুপরিজ্ঞাত। এটাই হলো মূল কারণ যে, আল-কুরআনের সকল বিষয়ের প্রতিই নজর দেয়া হয়েছে এবং পরস্পর সমন্বিত আকারে এর সকল বক্তব্য পেশ করা হয়েছে।

বহির্সংঘাত

এক্ষেত্রে দ্বিতীয় বিষয়টি হলো বাইরের জগতের সাথে সংঘাত। অর্থাৎ কোনো বিষয়ে গ্রন্থের মধ্যে যে বক্তব্য উলিখিত হয়েছে তার সাথে বহির্জগতের কোনো বাস্তবতার সাথে সংঘাত বা বৈপরীত্য সৃষ্টি হওয়া। এটা এমন একটা দুর্বলতা যা মানব রচিত সকল গ্রন্থেই উপস্থিত। মানুষ তার সীমিত জ্ঞানের আলোকে কথা বলে। আর মানুষের জ্ঞান ও মেধার পরিধি যেহেতু সীমিত, তাই তার বক্তব্য বহির্জগতের বাস্তবতার সাথে সংঘাতময় হয়ে পড়ে। এখানে আমি কয়েকটি তুলনামূলক উদাহরণ দিচ্ছি।

প্রাকৃতিক নিয়মের উদাহরণ

তদানিন্তন আরবে এ রেওয়াজ ছিল যে, পরিবারে সদস্যদের সংখ্যা বেড়ে গিয়ে অর্থনৈতিক সংকট সৃষ্টি হবে বলে আশঙ্কা করে কেউ কেউ স্বীয় সন্তানকে জীবন্ত হত্যা করত। এ প্রথাকে রহিতকরণার্থে আল কুরআনে নির্দেশ দেয়া হলো।

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا . الإسراء : ٣١

"তোমরা তোমাদের সন্তানদের দারিদ্রের ভয়ে হত্যা করো না। আমি তাদের রিজিকের ব্যবস্থা করব এবং তোমাদেরও, তাদের হত্যা করা নিশ্চয়ই বড়ো অন্যায়"

এ ঘোষণাটি আল কুরআনের একটা দাবি হিসেবে ধরে নেয়া যায়। অর্থাৎ ভবিষ্যতে পৃথিবীর জনসংখ্যা যতোই বাড়ুক, এতে আশঙ্কা করার কিছু নেই। বরং মানুষের সংখ্যার সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করে রুটি-রিজিকের সরবরাহ ও সমান তালে চলতে থাকবে। যেভাবে আজকের মানুষেরা রুটি রিজিক পাচ্ছে আগামী দিনের মানুষেরাও তদ্রুপভাবেই পাবে।

বিশ্বাসগত দিক থেকে মুসলমানরা এ ঘোষণার সত্যতা সব সময়ই মেনে আসছে। এ কারণেই দারিদ্র্যের ভয়ে জন্মনিয়ন্ত্রণের মানসিকতা মুসলমানদের মধ্যে কখনই ব্যাপক আকার ধারণ করেনি। মুসলমানগণ আলাহকে রিজিকদাতা হিসেবে মেনে নিয়ে এ ব্যাপারে আলাহর উপরই ভরসা করে। কিন্তু এ ঘোষণার এক হাজার বছর পর ইংলান্ডের রবর্ট ম্যালথাস (১৭৬৬-১৮৩৪) জন সংখ্যার উপর তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থখানা রচনা করেন যার পুরো নাম :

An Essay on the principal of Population as it affects the Future Improvement of Society

জনসংখ্যা যখন বল্গাহীন ছেড়ে দেয়া হয় তখন তা জ্যামিতিক হারে বাড়তে থাকে পক্ষান্তরে খাদ্যসামগ্রীর বর্ধন প্রক্রিয়া হয় গাণিতিক হারে।"

এর অর্থ হলো জনসংখ্যার বর্ধন ও খাদ্যসামগ্রীর উৎপাদন ও বর্ধন প্রক্রিয়া সমানুপাতিক হারে সম্পন্ন হয় না। কারণ, জনসংখ্যা জ্যামিতিক তথা ১-২-৪-৮-১৬-৩২-৬৪ হারে বাড়তে থাকে আর খাদ্য বাড়ে গাণিতিক তথা ১-২-৩-৪-৫-৬-৭-৮ হারে। অর্থাৎ জনসংখ্যা অত্যন্ত দ্রুতগতিতে বেড়ে যায় আর সে তুলনায় খাদ্যসামগ্রীর বর্ধনপ্রক্রিয়া হয় খুবই মন্থর গতিসম্পন্ন।

এ অবস্থার আলোকে ম্যালথাস বলেছেন, পৃথিবীর বুকে মানবপ্রজন্মকে বাঁচাতে হলে জন্মনিয়ন্ত্রণের আশ্রয় নেয়া ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। জনসংখ্যাকে যে কোনো মূল্যেই হোক নির্দিষ্ট সীমানা অতিক্রম করতে দেয়া যাবে না। অন্যথায় অতি শীঘ্রই সে দিন আসছে যখন খাদ্যসামগ্রীর অসম বর্ধনের কারণে দারিদ্র্যের যুগ শুরু হবে এবং অসংখ্য মানুষ খাবার না পেয়ে মারা যাবে। ম্যালথাসের উলিখিত বইটি চিন্তাজগতে সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলেছে। ম্যালথাসের সমর্থনে অসংখ্য লেখক ও বক্তা দাঁড়িয়ে গিয়েছে। পরিশেষে বিশ্বজুড়ে জন্মনিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনার পানপ্রোগ্রাম ও প্রচেষ্টা বহুধা ধারায় চলতে শুরু করে। কিন্তু আজকের গবেষক ও চিন্তাবিদগণ ম্যালথাসের ধারণাকে নির্ঘাত ভুল বলে আখ্যায়িত করেছেন। গবেষক Gwynne Dyer এক্ষেত্রে পরিচালিত গবেষণা সমূহের সারসংক্ষেপ একটি প্রবন্ধ পেশ করেছেন। প্রবন্ধটির অর্থবহ শিরোনাম হলো ম্যালথাস : মিথ্যা নবী'

Malthus : the False Prophet

প্রাবন্ধিক বিচার বিশেষণপূর্বক বলেন–

It is the 150th anniversary of Malthus's death, and his grim prediction have not yet come true. The World's population has doubled and redoubled on a geometrical progression as he foresaw, only slightly checked by wars and other catastrophes, and now stands at about eight times the total when he wrote. But food production has more thebe kept pace. and the present generation of humanity on average the fed in history.

ম্যালথাসের মৃত্যুর পর ১৫০ বছর পেরিয়ে গেল কিন্তু তার ভবিষ্যৎবাণীর সত্যতা আজো প্রমাণিত হলো না। পৃথিবীর জনসংখ্যা তার কথা মতই জ্যামিতিক হারে দ্বিগুণ ও চতুর্গুণ বেড়ে গেছে, যুদ্ধ ও অন্যান্য দুর্ঘটনা হেতু যৎসামান্য নিয়ন্ত্রিত হয়ে ম্যালথাসের গ্রন্থ রচনার সময়ের তুলনায় প্রায় আটগুণ বেড়ে গেছে। তবে খাদ্য সামগ্রীও কিছু বরং বর্ধিত আকারেই সমান্তরাল রেখায় চলেছে এবং মানবজাতি ইতিহাসের সকল যুগের তুলনায় বর্তমানে ভালো খাবার খাচ্ছে। [হিন্দুস্তান টাইমস ২৮ ডিসেম্বর ১৯৮৪]

রবার্ট ম্যালথাস গতানুগতিক কৃষিকর্মের যুগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি ভাবতে পারেননি যে অতি শীঘ্রই এমন বিজ্ঞাননির্ভর কৃষিকর্মের যুগ আসছে যখন খাদ্যোৎপাদন প্রক্রিয়ায় অভূতপূর্ব বিপব ঘটে যাবে। বিগত পঞ্চাশ বছরে চাষাবাদ পদ্ধতিতে অভূতপূর্ব পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। বর্তমানে এমন উন্নত বীজ বপন করা যায় যা অধিক ফলন দিতে সক্ষম। পশুর ব্যাপারটাও ঠিক একই রকম। ভূমি উর্বর করারও নতুন নতুন পথ পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে। মেশিনের সাহায্যে ঐসব জায়গায় চাষাবাদের ব্যবস্থা করা হচ্ছে যেখানে পূর্বে চাষাবাদ করা অসম্ভব বলে মনে হতো। উন্নত বিশ্বে কৃষকদের সংখ্যা শতকরা ৯০ ভাগ কমে যাওয়া সত্ত্বেও কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন দশগুণ বেড়ে গেছে, ইত্যাদি।

অনুন্নত বিশ্বের ভাগে ভূমি সম্পদের যে অংশ রয়েছে তার উপরই ৩৩ বিলিয়ন মানুষ বসবাস করতে পারে যেখানে বর্তমানে মাত্র ৩ বিলিয়ন। উন্নয়নশীল ও অনুন্নত বিশ্বের জনসংখ্যা বর্তমানের তুলনায় আরো দশগুণ বেড়ে গেলেও তাদের নিজস্ব ভূমি থেকেই তাদের খাদ্য সরবরাহ হবে। F.A. O হিসেব করে দেখেছে যে, তৃতীয় বিশ্বের জনসংখ্যা যদি বল্গাহীনভাবে ছেড়ে দেয়া হয় এবং ২০০০ সালে ৪ বিলিয়নে গিয়ে দাঁড়ায় তাহলেও ভয় পাওয়ার কিছু নেই। কারণ, এর চেয়ে দেড়গুণ বেশি জনসংখ্যাকে খাদ্য সরবরাহের ক্ষমতা তৃতীয় বিশ্বের ভূমিতেই রয়েছে। খাদ্যসামগ্রীর এই বৃদ্ধি বনজঙ্গল ইত্যাদি কর্তন করা ছাড়াই সম্পন্ন হবে।

তাই, না রয়েছে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে খাদ্যসমস্যা সৃষ্টির কোনো সম্ভাবনা, না রয়েছে দেশীয় পর্যায়ে খাদ্য ঘাটতির কোনো আশংকা। গোয়াইন ডাইয়ার তার রিপোর্ট এভাবে শেষ করেছেন,

Malthus was wrong. we are not doomed to breed ourselves into famine.

ম্যালথাস ভুলের মধ্যে ছিলেন। আমাদের ভাগ্যলিপি এমন নয় যে, আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মসমূহকে দুর্ভিক্ষকবলিত পরিবেশে জন্মাতে হবে।

এ ঘটনাটি অত্যন্ত পরিস্কারভাবেই ব্যক্ত করেছে যে, ম্যালথাসের গ্রন্থ 'জনসংখ্যার মূলনীতি' মানুষের ব্রেইনপ্রসূত একটি ধারণা। আর মানুষ একটি নির্দিষ্ট আবর্তের মধ্যে সীমিত থেকে তার চিন্তাধারাকে

রূপদান করে থাকে। এর বিপরীতে আল কুরআন এমন এক সত্ত্বার প্রত্যাদিষ্ট বাণী যার জ্ঞানের কোনো সীমা– পরিসীমা নেই। ম্যালথাসের থিউরি অপ্রাকৃতিক এবং বহির্জগতের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ। পক্ষান্তরে আল কুরআন বর্হিজগতের সকল বাস্তবতাকে সামনে রেখে তার থিউরি উপস্থাপন করেছে। আল করআনের বর্ণনা ও বহির্জগতের ঘটনাসম্ভারের মাঝে কোনই পার্থক্য নেই।

পবিত্র গ্রন্থের উদাহরণ

বণী ইসরাইল নবী ইউছুফের যুগে, খ্রিষ্টপূর্ব ২০ সালে, মিশরে প্রবেশ করে এবং নবী মুসার যুগে, ত্রয়োদশ শতাব্দীতে, মিশর থেকে বের হয়ে সায়না (সিনাই) উপত্যকায় পৌঁছায়। বিষয়টি বাইবেল ও কুরআন উভয় গ্রন্থেই বর্ণিত হয়েছে। তবে আল কুরআনের বর্ণনা ঐতিহাসিক বাস্তবতার সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ। পক্ষান্তরে বাইবেল- এ এমন কিছু বক্তব্য রয়েছে যা ঐতিহাসিক সত্যতা বিবর্জিত। সুতরাং বাইবেলে বিশ্বাসকারীদের এ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় যে, তারা হয়ত বাইবেলের বর্ণনাকে মেনে নিবে নতুবা ঐতিহাসিক সত্যতাকে মেনে নিয়ে বাইবেলের বর্ণনা অস্বীকার করবে। কারণ উভয়টিকে একই সাথে মেনে নেয়া কিছুতেই সম্ভব নয়।

১২ জানুয়ারি ১৯৮৫ তগলোকাবাদে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক স্টাডিজ এর একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে বক্তা ছিলেন Ezra kolet যিনি ভারতে বসবাসরত ইহুদিদের কাউন্সিল (Council of Indian Jewry) – এর সভাপতি। বক্তৃতার শিরোনাম ছিল What is Judaism ?(ইহুদিবাদ কী)

ইহুদি বক্তা তাঁর বক্তব্যে ইহুদিদের ইতিহাস তুলে ধরলেন। ইহুদিদের মিসর গমন এবং সেখান থেকে প্রত্যাবর্তনের ব্যাপারেও তিনি আলোকপাত করলেন। এক্ষেত্রে নবী ইউছুফ এবং নবী মুসার প্রসঙ্গ আসলে নবী ইউছুফ এবং মুসা আঃ উভয়ের সমসাময়িক মিশরীয় রাজার নাম ফেরাউন বলে উলেখ করলেন।

কিন্তু ইতিহাস সম্পর্কে যার মোটামুটি ধারণা রয়েছে তিনি জানেন যে, এ কথাটা নিতান্তই ভুল। ইতিহাস বলে যে, 'ফেরাউন' খেতাবধারী বাদশাহদের শাসন পরবর্তীতে নবী মুসার আঃ যুগে ছিল। তবে এর পূর্বে নবী ইউছুফের যুগে মিশরে ছিল অন্য লোকদের শাসন।

নবী ইউছুফ আ. যে সময় মিসরে অনুপ্রবেশ করেন সে সময় Hyksos kings - †` দের শাসন চলছিল। এরা আরব বংশোদ্ভূত এবং বাইরে থেকে এসে মিসরের সিংহাসন দখল করে নেয়। এ পরিবারটি খ্রিষ্টপূর্ব দু হাজার সাল থেকে শুরু করে খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চাদশ শতাব্দী পর্যন্ত মিশরের শাসক হিসেবে রাজত্ব চালিয়ে যায়। এরপর মিশরে বহিরাগত শাসকদের বিরুদ্ধে আন্দোলন হয় এবং হেকসস পরিবারের রাজত্ব অবলুপ্ত হয়। এরপর থেকে মিশরের শাসনভার স্বদেশী রাজাদের হাতে চলে যায়। এ সময় যে পরিবারটি মিশরের শাসনভার হাতে নেয় তাদের বাদশাদের তারা ফেরাউন খেতাবে ভূষিত করে। ফেরাউনের শাব্দিক অর্থ সূর্য- দেবতার সন্তান। সেকালে মিশরের লোকেরা সূর্যের পূজা করত। অতঃপর মিশরীয়দের উপর শাসনাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তারা দাবি করে বসল যে, তারা সূর্য দেবতার সন্তান।

মি. Ezra kolet যা কিছু বললেন, এসবের বাইরে কিছু বলার সুযোগও অবশ্য তার ছিল না। কারণ, বাইবেল-এ এরকমই লেখা রয়েছে। অর্থাৎ, নবী ইউছুফের আ. এর যুগের শাসক গোষ্ঠীর নামও ফেরাউন এবং নবী মুসার আ. এর সমসাময়িক বাদশার নামও ফেরাউন। মি. Ezra kolet বাইবেল অথবা ইতিহাস এ দুটির মধ্যে যে কোনো একটিতে নিতে পারছিলেন। উভয়টিকে একসাথে নেয়া কিছুতেই সম্ভব ছিল না। আর যেহেতু তিনি ইহুদী সম্প্রদায়ের নেতা তাই তিনি বাধ্য হয়েই ইতিহাসকে জলাঞ্জলি দিয়ে বাইবেলকেই আপন করে নিলেন।

কিন্তু আল-কুরআনের বর্ণনায় এ ধরনে কোনো বৈপরীত্য খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই আল কুরআনে বিশ্বাসীদের এ ধরনের কোন সমস্যায় পড়তে হয় না যে, আল কুরআনের বক্তব্যে বিশ্বাস করতে গিয়ে তাদেরকে ঐতিহাসিক সত্যকে জলাঞ্জলি দিতে হবে। আল কুরআন নাযিল হওয়ার সময় এই ঐতিহাসিক ঘটনাসমূহ মানুষের অজানা ছিল। এ ইতিহাস তখনও প্রত্নতত্ত্ব আকারে জমিনের নিচে লুকিয়ে ছিল যা বহুপরে উদঘাটিত করে মিসরের ইতিহাস নতুন করে ঢেলে সাজানো হয়েছে।

তা সত্ত্বেও আমরা দেখতে পাই যে, নবী ইউছুফের আ. সমকালীন মিশরীয় বাদশাহর কথা উলেখ করতে গিয়ে আল কুরআন তাকে মিসরের বাদশাহ বলেই খেতাব করছে এবং নবী মুসার সমকালীন বাদশাহকে বারবার ফেরাউন বলে আখ্যায়িত করছে। এভাবে আল কুরআনে আলোচিত বর্ণনা ও বহির্জগতের বাস্তবতার সাথে এক অকল্পনীয় মিল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। পক্ষান্তরে বাইবেলের বর্ণনার সাথে বহির্জগতের বাস্তবতার সাথে রয়েছে দুর্ভেদ্য সংঘাত। এর অর্থ দাঁড়ায় এই যে, আল-কুরআনের রচয়িতা এমন এক সত্ত্বা যিনি মানবজ্ঞানের সীমা-পরিসীমার বাইরে সকল বাস্তবতাকে সরাসরি প্রত্যক্ষ করছেন।

ইতিহাসের উদাহরণ

ডারউইনের অভিব্যক্তিবাদ অনুসারে মানুষ ও পশুর বংশসূত্র এক ও অভিন্ন। পশুর একটি প্রজন্ম উন্নতি সাধন করে বানর (শিম্পাঞ্জি)-এর পর্যায়ে পৌছে। পরবর্তীতে বানরের এ প্রজন্মটি আরো অগ্রসর হয়ে মানুষের আকার ধারণ করে।

এ মর্মে একটি প্রশ্ন ছিল এই যে, ঘটনা যদি সত্য হয় তাহলে মানুষ ও পশুর মধ্যবর্তী অধ্যায়গুলো কোথায়? অর্থাৎ ঐ প্রজাতিগুলো কোথায়, ক্রমোন্নতি প্রক্রিয়ায় মাঝ পথে থাকার ফলে সেগুলোতে কিছু ছিল মানবিক বৈশিষ্ট্য আর কিছু ছিল পাশবিক। যদিও বাস্তবে এ ধরনের অন্তর্বর্তী কোনো যোগসূত্র আবিস্কৃত হয়নি তবুও অভিব্যক্তিবাদে বিশ্বাসীদের নিকট এ ধরনের যোগসূত্র নিশ্চয়ই অতিবাহিত হয়েছে। এই তথাকথিত যোগসূত্রগুলোকে নিতান্ত ভূলক্রমেই হারিয়ে যাওয়া লিংকস (missing links) বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

১৯১২ খ্রিষ্টাব্দে লন্ডনের সংবাদপত্রসমূহ খুব জোশের সাথেই এ সংবাদ পরিবেশন করে যে, মানুষ ও বানরের মাঝে হারিয়ে যাওয়া একটি লিংক আবিস্কৃত হয়েছে। এটাই সে লিংক যা অভিব্যক্তিবাদের ইতিহাসে Piltdwon man নামে পরিচিতি। ঘটনা ছিল এই যে, লন্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়ামে পুরাতনকালের একটি কংকাল পাওয়া গেল যার আকৃতি বানরের মতো ছিল এবং দাঁতগুলো ছিল মানুষের মতো। এই কংকালের উপর ভিত্তি করেই একটি পূর্ণাঙ্গ আকৃতি তৈরি করা হয় যা ছিল বানর সাদৃশ্য মানুষ বা মানুষ সাদৃশ্য বানার। এ আকৃতিকেই পিল্টডাউন ম্যান নাম দেয়া হয়। কারণ, তা পিল্টডাউন নামক জায়গা থেকে উদ্ধার করা হয়।

পিল্টডাউন ম্যান খুব সহজেই গ্রহণযোগ্যতা পায়। এমনটি পাঠ্যপুস্তকেও সে স্থান করে নেয়। উদাহরণস্বরূপ R.S.LULL- এর Organic Evolution গ্রন্থে। বড় বড় জ্ঞানী ও চিন্তাবিদগণ এটাকে আধুনিক মানুষের একটা বিজয় হিসেবে দেখেন। উদাহরণস্বরূপ এইচ-জি-ওয়েলস তাঁর গ্রন্থ The outline of history তে ও বার্ট্রান্ড রাসেল। (১৮৭২-১৯৭০) তাঁর গ্রন্থ A history of western philosophy - তে । ইতিহাস ও প্রাণীবিদ্যার বইসমূহে পিল্টডাউন ম্যানের উলেখ এভাবে হতে শুরু করে যে মনে হয় যেন এটা একটা প্রতিষ্ঠিত সত্য।

প্রায় অর্ধশতাব্দী পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা এই নব আবিস্কারে বিমোহিত ছিলেন। কিন্তু ১৯৫৩ সালে কয়েকজন বিজ্ঞানী এ ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করলেন। তারা ব্রিটিশ মিউজিয়ামের ফাইয়ারপ্রুফ বাক্স থেকে উক্ত কংকালটি বের করলেন। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে উক্ত কঙ্কালটি পরীক্ষা করে দেখলেন। সকল দিক থেকে এটাকে পরখ করে দেখার পর বিজ্ঞানীরা ঘোষণা দিলেন যে, এটা কেবলই একটা ধোকা যাকে বাস্তব বলে ভুল করা হয়েছিল।

পিল্টডাউন ম্যানের আসল ঘটনা ছিল এই যে, এক ব্যক্তি একটা বানরের কঙ্কাল নিয়ে তা মেহগণি রঙে রাঙ্গায় এবং এর দাঁতগুলো ঘসে মানুষের দাঁত সাদৃশ্য করে এই বলে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রেখে দেয় যে ইহা পিল্টডাউন জায়গা থেকে আবিস্কার করা হয়েছে।

এটা বড়োই চিত্তাকর্ষক কাহিনী। এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানার জন্য নিম্নোক্ত তথ্যসূত্র সমূহ দেখা যেতে পারে।

1. Encyclopaedia Britannica (1984) ``Piltdown man"
2. Bulletin of the British museum (Natural History) vol. 2, No 3and 6.
3. J.S. Weiner, the Piltdown forgery (1955)
4. Ronald Millar, the Piltdown Men (1972)
5. Readers Digest, November (1956)

নবী মুসার ফেরাউন

এর বিপরীতে আল কুরআন থেকে একই রকম একটি উদাহরণ নিন। আর তাহল নবী মুসার যুগের ফেরাউনের উদাহরণ। এ ফেরাউন সম্পর্কে আল কুরআনে আশ্চর্যজনকভাবে ইতিহাস তার সত্যতার পক্ষে সাক্ষী দিচ্ছে।

ইতিহাস অনুসারে নবী মুসা আ. এর যুগে যে ফেরাউন ছিল সে রমসীস দ্বিতীয় এর সন্তান ছিল। তার বংশগত উপাধি ছিল ফেরাউন এবং ব্যক্তিগত নাম ছিল মার্নেপটাহ (Merneptah) কুরআন নাযিল হওয়ার সময় এ ফেরাউনের উলেখ কেবল বাইবেলের পাণ্ডুলিপিসমূহে ছিল। সেখানেও শুধু এটাই লিখা ছিল যে, 'প্রভু সমুদ্রের মাঝখানেই মিসরীদেরকে ধবংস করে দিলেন এবং সকল সৈন্যসমেত ফেরাউকে ডুবিয়ে দিলেন (আল–খুরুজ : ১৪-১৮) এ সময় আল কুরআন আর্শ্চযজনকভাবে ঘোষণা দিল যে ফেরাউনের শরীর সংরক্ষিত রয়েছে এবং তা পৃথিবীবাসীর জন্য শিক্ষণীয় বিষয় হিসেবে থাকবে।

فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ ﴿٩٢﴾ سورة يونس

"অতএব আমি আজ বাঁচিয়ে দিচ্ছি তোমার দেহকে যাতে তোমার পশ্চাদবর্তীদের জন্য নিদর্শন হতে পারে।"

আল কুরআনে যখন এ আয়াত নাযিল হলো তখন সত্যিই এ বক্তব্যটি আশ্চর্যজনক ছিল। সে সময় কারোই জানা ছিল না যে, ফেরাউনের মৃতদেহ কোথাও সংরক্ষিত আকারে রয়েছে। এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর এভাবেই চৌদ্দশত বছর অতিক্রান্ত হলো। প্রফেসর লরেট হলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি ১৮৯৮ সালে মিসরের এক পুরাতন কবরস্থানে গিয়ে দেখতে পেলেন যে উলিখিত ফেরাউনের লাশ মমিকৃত আকারে বিদ্যমান রয়েছে। ৮ জুলাই ১৯০৭ ইলিওট স্মিথ উক্ত লাশের উপর থেকে চাদর সরালেন এবং তার উপর ১৯১২ সালে একটা তথ্যবহুল বই প্রকাশ করলেন যার নাম ছিল The rowel mummies এ থেকে পরিস্কারভাবেই প্রমাণিত হয়ে গেল যে, এই মমিকৃত লাশটি তিন হাজার বছর পূর্বে নবী মুসা আঃ এর যুগের ফেরাউনের যে মুসা আ. এর পশ্চাদ্ধাবন করতে গিয়ে ডুবে মরেছে। পশ্চাত্যের জনৈক চিন্তাবিদের ভাষায় : His earthly remains were saved by the will of God from destruction to become a sign to man, as it is written in the Quran.

বাইবেল, কুরআন ও বিজ্ঞানের লেখক ড. মরিস বুকাইলি ১৯৭৫ ইং সালে ফেরাউনের এ লাশটি খুঁটিয়ে দেখেন। এরপর তিনি এ বিষয়ে তাঁর গ্রন্থে যে অধ্যায় স্থাপন করেন, তার উপসংহার নিম্নোক্ত মর্মস্পর্শী শব্দমালার মাধ্যমে টানেন– Those who seek among modern data for proof of the veracity of the Holy Scriptures will find a magnificent Illustration of the verses of the Quran dealing with the pharaoh's body by visiting the Royal Mummies room of the Egyptian museum,cairo1!

"যারা পবিত্র গ্রন্থসমূহের সত্যতার ব্যাপারে নতুন দলিল প্রমাণ তালাশ করেন, তারা যেন কায়রোয় অবস্থিত মিসরীয় যাদুঘরের রাজকীয় মমি কক্ষ ঘুরে দেখেন। সেখানে আল কুরআনের ঐসব আয়াতের চমৎকার ব্যাখ্যা পাবে যেগুলোতে ফেরাউনের লাশের ব্যাপারে আলোচনা রয়েছে।"

সপ্তম শতাব্দীতে আল কুরআন ঘোষণা দিয়েছে যে ফেরাউনের শরীর মানুষের জন্য নিদর্শনরূপে সংরক্ষিত রয়েছে, আর ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে এসে আল কুরআনের এ ঘোষণার সত্যতা শতধা ধারায় পরিস্ফুটিত হয়ে সবাইকে চমকিয়ে দিয়েছে। অন্যদিকে বর্তমান যুগে বিজ্ঞানীরা ঘোষণা দিলেন যে, পিল্টডাউন নামক জায়গায় তারা একটি কাঠামো আবিস্কার করেছেন যা পুরাতন মানুষের শরীরের অংশ। কিন্তু পরবর্তী যুগের বৈজ্ঞানিক তথ্য এ দাবীকে মিথ্যা বলে প্রমাণিত করল।

এর পরেও কি ওহীর সত্যতা তথা আল কুরআনের ঐশিক উৎস সম্পর্কে কারো হৃদয়ে কোনো সন্দেহ থাকার অবকাশ থাকে।

জীববিজ্ঞানের উদাহরণ

পুরাতন কালে, যখন বৈজ্ঞানিক আবিস্কারসমূহ তখনো জনসমূক্ষে আসেনি, তখন সারা পৃথিবী জুড়েই অযৌক্তিক অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারের ছিল ব্যাপক ছড়াছড়ি। মানুষ পরীক্ষা নিরীক্ষা ব্যতীতই

অযৌক্তিক ধ্যান-ধরণা ও থিউরি কায়েম করে বসত। মানুষের এসব চিন্তাধারা ও থিউরি তদানিন্তন কালের বই পুস্তকেও নির্বিঘ্নে উঠে আসতো। সে যুগে তখনই কেউ কোন গ্রন্থ রচনা করতেন, পরিবেশ ও পরিপ্রেক্ষিতের দুর্ভেধ্য কুঠিরে আবদ্ধ হয়ে সে যুগের তথাকথিত ধ্যান– ধারণারই তারা পুনরাবৃত্তি ঘটাতেন।

উদাহরণস্বরূপ এরিস্টটল (৩৮৪-৩২২) একবার মাতৃগর্ভে বর্ধনশীল শিশুর কথা উলেখ করলেন। এক্ষেত্রে তিনি সেযুগের প্রচলিত ধারণা অনুসারে বলে ফেললেন, মাতৃগর্ভে বাচ্চার সুস্থতা আবহাওয়ার সাথে সম্পৃক্ত। এরিস্টটলের ধারণার, পরিহাস করে বার্ট্রান্ড রাসেল বললেন, He said that children will be healthier if conceived when the wind is in the north. One gathers that the two Mrs Aristotle's both had to run out and look at the weathercock every evening before going to bed (p-17)

"এরিস্টটল বলেছেন যে, উত্তরের হাওয়া প্রবাহের সময় গর্ভধারণ হলে শিশু স্বাস্থ্য ভালো থাকে। এ থেকে কেউ ধারণা করতে পারে যে, এরিস্টটলের দুই স্ত্রীকে প্রতিদিন সন্ধ্যায় বিছানায় যাওয়ার পূর্বে দৌড়িয়ে বাইরে গিয়ে দেখে নিতে হতো, আজকের হাওয়া কোনদিক থেকে প্রবাহিত হচ্ছে। "

আল- কুরআন সেই পুরনো যুগেই অবতীর্ণ হয় এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা-সংক্রন্ত বহু বর্ণনা এতে এসেছে। কিন্তু আল কুরআনের একটি উদাহরণও পাওয়া যাবে না যেখানে সে সময়কার প্রচলিত ধ্যান ধারণার প্রতিধ্বনি রয়েছে।

গ্রহ-নক্ষত্রের গতিবিধি

আল-কুরআনের সূরা আম্বিয়া ৩৩ ও ইয়াসিন ৪০ এ চন্দ্র ও সূর্য সম্পর্কে এরশাদ হয়েছে যে, প্রত্যেকেই তার নিজস্ব গন্ডিতে সাতরাচ্ছে।

كل في فلك يسبحون

ড. মরিস বুকাই এতৎসংক্রন্ত আয়াত নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, ফালাক বলতে সেটাকে বুঝানো হয়েছে যা আমরা বর্তমান যুগে orbit তথা কক্ষপথ হিসেবেই জানি। এই মর্মে তিনি বলেন–

it is shown that the sun moves in an orbit, but no indication is given as to what this orbit might be in relation to the Earth. At the time of the Quranic Revelation, it was thought that the sun moved while the Earth stood still. This was the system of egocentrism that had held way since the time of Ptolemy, second century B. C. and was to continue to do so until Copernicus in the sixteenth century A.D. Although people supported this concept at the time of Muhammad, it does not appear anywhere in the Quran, either here or elsewhere (p-159)

উলেখিত আয়াতসমূহে দেখানো হয়েছে যে, সূর্য একটি orbit এ ঘূর্ণায়মান। কিন্তু এ বিষয়ে কোনো ইঙ্গিত মিলে না যে, পৃথিবীর মোকাবেলায় এ ঘর্ণনের অবস্থান কী? আল কুরআন অবতরণ কালে মনে করা হতো যে, সূর্য ঘুরছে এবং পৃথিবী স্থির রয়েছে। এটা হলো পৃথিবী কেন্দ্রিক সৌর সিসটেম যা খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে টলেমির যুগ থেকে মানব চিন্তার উপর আধিপত্য করে আসছে। ষষ্ঠদশ শতাব্দী পর্যন্ত কোপারনিক্র এর যুগ পর্যন্ত এ ধারণা অবশিষ্ট থাকে। যদিও মুহাম্মদ সা. এর যুগের মানুষেরাও এ থিউরিতে বিশ্বাস করত, কিন্তু আল কুরআনের কোথাও এ ধারণার প্রকাশ ঘটেনি। না এই দুই আয়াতে না অন্য কোনো আয়াতে।

ভ্রূণ এর ক্রমবর্ধন

এক্ষেত্রে একটি চিত্যাকর্ষক উদাহরণ হলো ওইটি যা ১৯৮৪ সালের শেষে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় এসেছে। কানাডীয় পত্রিকা The Sit Zen 22 November 1984 এ সংবাদটির শিরোনাম দিয়েছিল এভাবে Ancient Holy Book 1300 years Ahead of its Time. 'পুরাতন পবিত্র গ্রন্থ, তার সময়ের তেরশত বছর পূর্বে। নয়াদিলী থেকে প্রকাশিত (Times of India, 10

December 1984) উক্ত সংবাদটি এই শিরোনামে পরিবেশন করেছে Quran Scores Over Modem Science আল কুরআন আধুনিক বিজ্ঞানের উপর বিজয় লাভ করছে।

ড. কেইথ মোর ভ্রূণবিজ্ঞান বিশেষজ্ঞ। তিনি কানাডার টোরোন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। তিনি আল কুরআনের কয়েকটি আয়াত যেমন সুরা আল মুমিনুন এর ১৪ আয়াত ও সুরা আল যুমার এর ৬ আয়াত নিয়ে বৈজ্ঞানিক তথ্য প্রমাণাদির আলোকে তুলনামূলকভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। তিনি সৌদী আরবের কিং আব্দুল আজিজ বিশ্ববিদ্যালয়েও বেশ কয়েকবার আসেন। তিনি দেখতে পান যে, আল কুরআনের বর্ণনার সাথে আধুনিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের আশ্চর্যজনক মিল রয়েছে। তিনি এই ভেবে হতবিহবল হলেন যে, আল কুরআনে কীভাবে ওইসব তথ্যের উপস্থিতি সম্ভব হলো যেগুলো পাশ্চাত্যবিশ্বে কেবল ১৯৪০ সালে প্রথমবার আবিস্কৃত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে তিনি একটি প্রবন্ধ লিখেন যেখানে তিনি উপরোক্ত বিষয়টির ব্যাপারে বলেন।

The 1300 year old koran contains passages so accurate about embryonic development that Muslim can reasonably believe them to be revelations from God.

'তেরশত বছরের পুরনো আল কুরআনে ভ্রূণের বর্ধন প্রক্রিয়া সম্পর্কে এত সঠিক তত্ত্ব রয়েছে যে, মুসলমানরা যুক্তিযুক্ত কারণেই আল কুরআনকে স্রষ্টার পক্ষ থেকে ওহীকৃত গ্রন্থ হিসেবে বিশ্বাস করতে পারে।'

নিউটনের থিউরিঃ

মানুষ যখনই কোনো বিষয়ের উপর কথা বলে তখনই অত্যন্ত পরিস্কার হয়ে যায় যে, সে বর্তমানের আলোকে বলছে, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তার আদৌ কোনো ধারণা নেই। কোন ব্যক্তিই ভবিষ্যতে প্রকাশিতব্য বাস্তবতাসমূহ জানে না। এ জন্য তার বক্তব্যেও সেগুলোর কোনো বিচার থাকে না। এটা এমন একটা মানদণ্ড যেখানে সকল মানুষই ব্যর্থ হতে বাধ্য। এর বিপরীতে আল কুরআনে নজর দিলে প্রতীয়মান হবে যে, আল কুরআনের ওহীকারী এমন এক সত্ত্বা যার দৃষ্টি অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত পর্যন্ত পরিব্যপ্ত। তিনি বর্তমানের সকল ঘটনাকেই জানেন, যেমন জানেন এমনসব বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ যা ভবিষ্যতে মানুষের জ্ঞানের আওতায় আসবে।

উদাহরণস্বরূপ, নিউটন আলোর ব্যাপারে (১৬৪২-১৭২৭) এই থিউরি দাঁড় করান যে, ছোট ছোট আলোকিত অনু রয়েছে যেগুলো তার উৎসস্থল থেকে বের হয়ে শূন্যে উড়তে থাকে। এ থিউরিকে বিজ্ঞানের পরিভাষায় (Corpuscular theory of light) আলোর আনুবিক থিউরি বলা।

A theory of Optics in which light is treated as a stream of particles.

নিউটনের অসাধারণ প্রভাবের ফলে এ থিউরি ১৮২০ পর্যন্ত বিজ্ঞানের জগতে ছেয়ে থাকে। এরপর এর অধঃপতন শুরু হয়। বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক গবেষণা, বিশেষ করে photons এর কার্যকারিতার আবিস্কার আলোর আনবিক থিউরিকে শেষ করে দেয়। প্রফেসর ইয়াং ও অন্যান্যদের গবেষণা বিজ্ঞানীদের এই মর্মে আশ্বস্ত করে দেয় যে, আলোক মূলত ডেউ এর গুণ বিশিষ্ট যা নিউটনের corpuscular থিউরির সাথে পরিস্কারভাবে সাংঘর্ষিক- young's work convinced scientists that light has essential wave characteristics in apparent contradiction to new tons corpuscular (particle) theory. (Encyclopaedia Britannica, 1948, vol. 19,p-665)

নিউটন আঠারশ' শতাব্দীতে তার থিউরি উপস্থাপন করেন এবং শুধু দুইশত বছরের মধ্যেই তা ভুল প্রমাণিত হয়। এর বিপরীতে সপ্তম শতাব্দীতে পবিত্র কুরআন তার পয়গাম পৃথিবীবাসীর সামনে উপস্থাপন করে। এরপর চৌদ্দশত বছর অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পরও আল কুরআনের কোন বক্তব্যের সত্যতায় বিন্দুমাত্র সন্দেহের প্রশ্ন আসেনি। এর পরেও কি কোন সন্দেহের অবকাশ রয়েছে যে, নিউটনের মতো লোকদের বক্তব্য সীমিত মানুষের বক্তব্য, পক্ষান্তরে আল কুরআন অসীম জ্ঞানের অধিকারী মহান স্রষ্টার ওহীকৃত বাণী। আল কুরআনের বর্ণনা নিরঙ্কুশভাবে সঠিক প্রমাণিত হওয়া একটা অসাধারণ গুণ যা অন্য কোনো বাণী বা বক্তব্যের ক্ষেত্রে অনুপস্থিত। এ থেকে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হচ্ছে যে, আল কুরআন আলাহর পক্ষ থেকে প্রত্যাদিষ্ট বা ওহীকৃত কালাম, এটা কোনো মানুষের রচিত গ্রন্থ নয়।

মহাবিশ্বের শুরু

আল কুরআনে এরশাদ হয়েছে:

أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٠﴾ الأنبياء

'অস্বীকারকারীরা কি দেখেনি যে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী পরস্পরে সংযুক্ত ছিল, অতঃপর আমি এ দুটিকে পৃথক করে দিয়েছি। رتق শব্দের অর্থ পরস্পরে সংযুক্ত অংশবিশিষ্ট কোনো জিনিস। অর্থাৎ, কোন জিনিসের বিরাজমান সকল অংশ একটা আরেকটার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট ও সংযুক্ত অংশগুলো ছিন্নভিন্ন করে পৃথক করে দেয়া।

এ আয়াতটি খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে অবতীর্ণ হয়। বাহ্যত এ থেকে প্রতীয়মান হচ্ছিল যে, মহাবিশ্বের বিভিন্ন অংশ শুরুতে একটি আরেকটির সাথে সংযুক্ত ছিল। এরপর আলাহ এটাকে ছিন্নভিন্ন করে পৃথক করে দিয়েছেন। তবে কুরআন নাযিল হওয়ার পর শতাব্দীর পর শতাব্দী পেরিয়ে গেছে কিন্তু মানুষ উপলব্ধি করতে পারেনি যে, মহাবিশ্বের সাথে কী ধরনের আচরণ করা হয়েছে যাকে رتق এবং فتق বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। সর্বপ্রথম ১৯২৭ সালে এর মর্মার্থ সামনে আসে যখন জর্জ লিমাতট্রে (Georges limiter) Big Bang **নামক তত্ত্ব পেশ করেন।**

আধুনিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা একথা বলে যে, মহাবিশ্ব প্রতিমুহূর্তেই চতুর্দিকে সম্প্রসারিত হচ্ছে। যার ফলে বর্তমান মহাবিশ্বকে প্রসারমান মহাবিশ্ব বলা হয়। এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে বিজ্ঞানীরা এ তত্ত্ব পেশ করেছেন যে, মহাবিশ্বের শুরুতে সংকুচিত আকারে ছিল। সে সময় মহাবিশ্বের প্রত্যেকটা অংশা একটা আরেকটার সাথে খুব কঠিনভাবে সংযুক্ত ছিল। এই প্রাথমি পদার্থকে মহাজাগতিক ডিম্ব অথবা Cosmic Egg **অথবা** super Atom **বলা হয়।**

বৈজ্ঞানিক পরিমণ্ডলে প্রথমে এর বিরুদ্ধাচরণ করা হয়। ১৯৪৮ পর্যন্ত মহাবিস্ফোরণ থিউরির পরিবর্তে steady state hypothesis **বিজ্ঞানীদের কাছে বেশি গুরুত্বের বিষয় ছিল। কিন্তু ১৯৫০ সালে বিগব্যাঙ্গ এর পালা ভারি হতে শুরু করে। ১৯২৫ এ** Background Radiation **এর আবিস্কার এ বিষয়টি আরো বেশি পরিস্কার করে দেয়। কেননা, বিজ্ঞানীদের ধারণা মতে প্রাথমিক বিস্ফোরণের অবশিষ্ট কিছু অংশ এখনো মহাবিশ্বের কোনো জায়গায় যাওয়া যাবে। তদ্রূপভাবে ১৯৮১ সালে কিছু গ্রহের আবিস্কার যা আমাদের পৃথিবী থেকে দশ বিলিয়ন লাইট এয়ার** Light year **দূরত্বে অবস্থিত ইত্যাদি বিগব্যাঙ্গ থিউরির পক্ষে কাজ করছে। এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকায় ১৯৮৪ বিগব্যাঙ্গ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে স্বীকার করা হয়েছে যে, এখন এ থিউরি অধিকাংশ মহাজগৎ বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের কর্তৃক সমর্থিত** And it is now favored by most cosmologists.

এ ঘটনাটি অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে প্রমাণ করছে যে, আল কুরআনের রচয়িতা এমন এক সত্ত্বা যার কাছে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের ঘটনাপুঞ্জির সমানভাবে দৃশ্যমান। তিনি বিভিন্ন বিষয়কে ওই জায়গা থেকে দেখেছেন যেখানে মানুষ পৌঁছতে পারে না। তিনি সে সময়েও পুরোপুরি জানেন যখন অন্য কেউ কিছুই জানে না।

মধুর চিকিৎসাগুণ

আল কুরআনে মধু সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, মধুতে মানুষের জন্য রয়েছে শিফা বা রোগমুক্তি

فيه شفاء للناس . النحل : ٦٩

মুসলমানরা এই আয়াতের আলোকে মধুর চিকিৎসাগুণের উপর সবিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন। মুসলমানদের নিকট ওষধ প্রস্তুত প্রক্রিয়ায় মধুর গুরুত্ব অপরিসীম। তবে পাশ্চাত্য বিশ্ব বহু শতাব্দী যাবৎ মধুর গুরুত্বের ব্যাপারে বেখবর ছিল। ইউরোপে এইতো ঊনবিংশ শতাব্দীতেও মধুকে কেবল একটি তরল খাদ্য হিসেবে দেখা হতো। কেবল বিংশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় বিজ্ঞানীগণ আবিষ্কার করলেন যে, মধুর মধ্যে পচন বিরুদ্ধ গুণাগুণ রয়েছে। এই মর্মে আধুনিক গবেষণার সারমর্ম একটি আমেরিকান পত্রিকা থেকে তুলে ধরছি।

Honey is a powerful destroyer of germs which produce human diseases. It was nit until the twentieth century. however. that this was demonstrated

scientifically. Dr. w.G. Sacket, formerly with the Colorado Agricultural College at Fort Collins, attempted to prove that honey was a carrier of disease much like milk. To his surprise, all the disease germs he introduced into pure honey quickly destroyed. The germ that causes typhoid fever died in pied in pure honey after 48 hours exposure. Enteritidis, causing intestinal inflation, lived 48 hours. A hardy germ which causes bronchopneumonia and septicemia held out for four days. Bacillus coli Communist which under certain conditions causes peritonitis, was dead on the fifth day of experiment. According to Dr.Bodog Beck, there are many other germs equally destructible in honey. The reason for this bactericidal quality in honey, he said, is in its hygroscopic ability. It literally draws every particle of moisture out of germs. Germs, like any other living organism, perish without water. This power to absorb moisture is almost unlimited. Honey will draw moisture from metal, glass and even stone rocks. [Rosicrucian Digest, September 1975, p, 11]

মধু রোগজীবাণুকে ধ্বংস করে দেয় যা মানুষের নানাবিধ রোগ শোকের কারণ হয়। তবে বিংশ শতাব্দীর পূর্বে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে বিষয়টি উপস্থাপন করা সম্ভব হয়নি। ড. সাক্ট যিনি পূর্বে ফোর্ট কলিন্স এগ্রিকালচারাল কলেজের সাথে জড়িত ছিলেন, তিনি প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন যে, দুধের মতো মধুতেও রোগজীবানু বাসা করে নেয়। কিন্তু তিনি পরীক্ষা নিরীক্ষার সময় এই দেখে আশ্চর্য হয়েছেন যে, রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু, যেগুলো তিনি মধুর মধ্যে ছেড়েছেন, সবগুলোই অতিদ্রুত মরে গেছে। টাইফেয়েড এর জীবানু মাত্র ৪৮ ঘন্টার মাথায় মৃত্যুবরণ করেছে। কিছু শক্ত জীবাণু চারপাঁচদিনের বেশি জীবিত থাকতে পারেনি। ড. বুডক বেক (Bo dog beck) বলেছেন যে, মধুর মধ্যে রোগজীবাণু ধ্বংসাত্মক বৈশিষ্ট্যের উপস্থিতির সরল কারণ এই যে, মধু আর্দ্রতাকে শুষে নেয়ার ক্ষমতা রাখে। মধু রোগজীবাণুতে বিরাজিত আর্দ্রতার সবটুকু ছিনিয়ে নেয়। রোগজীবাণু অন্যান্য জীবজন্তুর মতোই পানিত ব্যতীত ধ্বংস হয়ে যায়। আর মধুতে পানি শুষে নেয়ার বিশেষ ক্ষমতা পর্যাপ্ত পরিমাণে রয়েছে। ধাতু, শিসা এবং পাথর থেকেও মধু আর্দ্রতা শুষে নিতে পারে।

আল কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব

আরবি ভাষা অন্যান্য ভাষা থেকে আশ্চর্য রকমভাবে ভিন্ন। ইতিহাস বলে যে, একটি ভাষার বয়স পাঁচশত বছরের বেশি হয় না। প্রায় পাঁচশত বছরে একটি ভাষা এত বেশি পরিবর্তিত হতে থাকে যে, পরবর্তী যুগের মানুষদের পূর্ববর্তীদের কথাবার্তা বুঝা খুব কষ্ট হয়ে পড়ে। উদাহরণস্বরূপ জেফরি চাসর (১৩৪২-১৪০০) এবং উইলিয়াম সেক্সপিয়ার (১৫৬৪-১৬১৬) ইংরেজি ভাষার বড় কবি ও সাহিত্যিক ছিলেন। কিন্তু আজকে একজন ইংরেজি জানা ব্যক্তির পক্ষে অভিধানের আশ্রয় নেয়া ছাড়া তাঁদের বই বুঝার কোনো উপায় নেই। চাসর এবং সেক্সপিয়রের লেখা বর্তমানকালের ইংরেজি স্কুলসমূহেও তরজমা করে করে পড়তে হয়। ঠিক একইরূপে যেমনটি করা হয় অন্য দেশী কোনো ভাষার ক্ষেত্রে। আরবি ভাষার ব্যাপারটা এ থেকে সর্ম্পর্ণ ভিন্ন। আরবি ভাষা বিগত দেড় হাজার বছর ধরে একই অবস্থা ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে। এ ভাষার শব্দ ও স্টাইলে নিশ্চয়ই কিছু পরিবর্তন এসেছে তবে এ পরিবর্তনপ্রক্রিয়া এভাবে হয়েছে যে, প্রতিটি শব্দ তার প্রাথমিক ও পুরনো অর্থকে ধরে রেখেছে। চৌদ্দশত বছর বছর পূর্বের কোনো আরব দেশীয় ব্যক্তি যদি দ্বিতীয় বার জীবিত হন তাহলে আজকের আরবদের ভাষা বুঝতে তার বিন্দুমাত্র কষ্ট হবে না।

এ বিষয়টি সরাসরি আল কুরআনের মোজেযা। মনে হয় যেন পবিত্র কুরআন আরবি ভাষাটাকে খুব শক্তভাবে ধরে রেখেছে, যাতে পবিত্র কুরআনকে, যেভাবে কেয়ামত পর্যন্ত বাকী থাকতে হবে তদ্রূপভাবে তদানিন্তন কালের আরবি ভাষা জীবন্ত ও বোধগম্য আকারে কেয়ামত পর্যন্ত বাকি থাকতে পারে। যাতে এ গ্রন্থকে কখনো ক্লাসিক্যাল লিটারাচারের আলমিরায় আবদ্ধ হয়ে যেতে না হয় এবং সকল যুগের মানুষ কর্তৃক সমানভাবে পঠিত হয় এবং সকলেই অনায়াসে এব বক্তব্য বুঝতে পারে।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের ব্যাপারটাও একই রকম। এখানেও যেন সকল প্রকার জ্ঞান-বিজ্ঞানকে আল কুরআন তার মুঠোয় শক্ত করে ধরে রেখেছে। যাতে যে মর্মে আল কুরআন যা বলে দিয়েছে তাই সর্বশেষ সিদ্ধান্ত হিসেবে বাকি থাকে। এ কারণেই বর্ণনাতীত বৈজ্ঞানিক উন্নতি সত্ত্বেও জ্ঞান-বিজ্ঞান সেখানে গিয়েই থেকে যায় যেখানে আল কুরআন প্রথম থেকেই চিহ্ন দিয়ে রেখেছে।

একদিকে মানুষের কথার অবস্থা তো এই যে ছোট ছোট ব্যাপারেও পূর্ণাঙ্গ মাপকাঠি পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে না, পক্ষান্তরে পবিত্র কুরআন অত্যন্ত জটিল ও গভীর বিষয়েও সর্বোচ্চ সত্যকে ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে। আমি এখানে একটি তুলনামূলক উদাহরন দিচ্ছি।

এরিস্টটল তাঁর কল্পিত সমাজে নারীকে তুলনামূলক নীচু দৃষ্টিতে দেখেছেন। এরিস্টটলের নিকট এর কারণ, মহিলাদের মুখে দাঁতের সংখ্যা পুরুষের তুলনায় কম হয়। বার্ট্রান্ড রাসেল এরিস্টটলের এ বক্তব্যের পরিহাস করে তাঁর – The Impact of Society' গ্রন্থে বলেন– Aristotle maintained that women have fewer teeth than men, although he was twice married, it never occurred to him to verify this statement by examining his wives mouths (p-17)

"এরিস্টটল দাবি করেছেন যে, মহিলাদের দাঁত পুরুষের তুলনায় কম। যদিও এরিস্টটল দুইবার বিয়ে করেছেন কিন্তু এমনটি কখনো ঘটেনি যে, তাঁর স্ত্রীদের মুখ পরীক্ষা করে এ বক্তব্যের সত্যতা যাচাই করবে।"

এরিস্টটলের বর্ণনা বাস্তবভিত্তিক হতে পারল না। এর বিপরীতে আল–কুরআনের বর্ণনা সকল বাস্ত বতাকে এমনভাবে আগলে রেখেছে যে, বাস্তবতা ও কুরআনের মাঝে কখনো টক্কর লাগে না।

এখানে একটি উদাহরণ দিচ্ছি। আল কুরআনে ইরশাদ হয়েছে যে, মহান আলাহ্ এই বিশ্ব জগতের উপর সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। আলাহ্ তার মর্জি মোতাবেক যেভাবে চান এটাকে পরিচালনা করেন। পিছনের শত সহস্র বছর ধরে আলাহ্ সংক্রান্ত এ ধারণা একটা স্বীকৃত বাস্তবতা হিসেবেই চলে আসছে। মানুষ বিনা দ্বিধায় এ বিশ্বাসকে তাদের বুকে ধারণ করে আসছে।

কিন্তু বর্তমান যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতি সাধিত হলে মানুষ এ থিউরি কায়েম করে বসল যে, প্রতিটি বিষয়ের পেছনে বস্তুকেন্দ্রিক জানা শোনা কিছু কারণ ব্যতীত অন্য কোনো ক্ষমতার কোনো দখল নেই।

সকল ঘটনাই বস্তুভিত্তিক কারণবসত সংঘটিত হয় এবং বস্তুভিত্তিক কায়দা কানুনের আওতায় পূর্ণাঙ্গরূপে ব্যাখ্যা করা যায়। তবে পরবর্তীকালের বৈজ্ঞানিক গবেষণা এই ধারণাকে নস্যাৎ করে দিয়েছে। বিজ্ঞান এখন দ্বিতীয়বার সেখানেই এসে দাঁড়িয়েছে যেখানে ছিল প্রথমে।

কারণতত্ত্বের মৃত্যু

বলা হয় যে, নিউটন (১৬৪২-১৭২৭) তার বাগানে ছিলেন। তিনি আপেল গাছ থেকে একটি আপেল মাটিতে পড়তে দেখলেন। তিনি ভাবলেন– আপেল ফলটি গাছ থেকে পৃথক হয়ে উপরের দিকে না গিয়ে নিচের দিকে পড়ল কেন?

এ প্রশ্ন তাঁকে মহাকর্ষ শক্তি আবিস্কার পর্যন্ত পৌঁছাল। এ মহাকর্ষ শক্তি সবকিছুকেই তার দিকে টানছে। এ কারণেই বৃক্ষ থেকে ছিড়ে ফল নিচের দিকে পড়ে, উপরের দিকে যায় না।

তবে এটা অর্ধেক বাস্তবতা। নিউটনের ভাবা উচিত ছিল যে, বৃক্ষের ফল যদি ওপর থেকে নিচের দিকে ছিটকে পড়বে তাহলে বৃক্ষের কাণ্ড নিচ থেকে ওপরে কেন যাবে?

বৃক্ষের এই দ্বিমুখী আচরণ নিউটনের ধারণাকে নস্যাৎ করে দিচ্ছিল। তবুও তিনি এ বিষয়টির দুটি দিকের মধ্যে একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটি নিয়ে এগুলেন এবং তার আলোকেই মহাশূন্যে ছড়িয়ে থাকা সোলার সিসটেমের মূলনীতিসমূহ লিপিবদ্ধ করলেন। তিনি এই রেজাল্টে পৌঁছলেন যে, সকল গ্রহ–নক্ষত্রেরই একটি বিশেষ অনুপাতে আর্কষণ ক্ষমতা রয়েছে। এ আকর্ষণ শক্তিই সূর্য ও তার পাশে ঘুর্ণায়মান গ্রহ নক্ষত্রগুলোকে ধরে রেখেছে এবং অত্যন্ত সুশৃঙ্খল আকারে সে গুলোকে চলমান রেগেছে।

এ চিন্তাধারা আরো অগ্রসর হলো। আইনস্টাইনের (১৮৭৯-১৯৫৫) আপেক্ষিবাদ এ ধারণাকে আরো শক্তিশালী করল। আইনস্টাইনের গবেষণা যদিও নিউটন কর্তৃক উপস্থাপিত সকল থিউরিকে স্বীকার করে না, তবুও সোলার সিসটেম সংক্রান্ত তাঁর থিউরির বুনিয়াদ 'মহাকর্ষ' মূলনীতির উপরই প্রতিষ্ঠিত।

Einstein's theory of relativity declares that gravity controls the behavior of planets, stars, galaxies and the universe itself and does it in a predictable manner.

আইনস্টাইনের আপেক্ষিকবাদ অনুসারে, মহাকর্ষ (graviry) গ্রহ, নক্ষত্র ও ছায়াপথসমূহের আচরণ এমনকি স্বয়ং মহাবিশ্বের আচরণকেও নিয়ন্ত্রণ করে থাকে এবং এ প্রক্রিয়াটি এভাবে হয় যে, এ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব।

এই বৈজ্ঞানিক আবিস্কারকে হিউম ও মহাবিশ্বের সবকিছুই কারণিক মূলনীতি (principle of causation) এর ওপর চলছে। যতদিন ঘটনার পেছনে লুকায়িত কারণসমূহের চেইনগুলো জানা ছিল না ততদিন মানুষ মনে করত যে, এ মহাবিশ্বকে নিয়ন্ত্রণকারী কোনো প্রভু রয়েছেন। কিন্তু আজকে যেহেতু কারণ ও হেতুসমূহ জানা হয়ে গেছে এখন আমরা জোড়ালোভাবেই বলতে পারি যে, কারণবাদের বস্তুকেন্দ্রিক মূলনীতিই এ বিশ্বকে কার্যকর রেখেছে, কোনো ধারণাজাত খোদা এর পেছনে আদৌ ভুমিকা রাখছেন না।

কিন্তু পরবর্তী যুগের চিন্তা ও গবেষণা এই ধারণার খুঁটি নড়বড়ে করে দিয়েছে। ডিরাক, হিজেন বার্গ এবং অন্যান্য বিজ্ঞানীরা পরমাণুর অবকাঠামো নিয়ে গবেষণা করে আবিষ্কার করেন যে, পারমাণবিক জগৎ ওই মূলনীতিকে অস্বীকার করছে যা সৌরজগৎ কেন্দ্রিক গবেষণার ভিত্তিতে দাঁড় করানো হয়েছে। এই দ্বিতীয় থিউরিকে কোয়ান্টাম থিউরি বলে নামকরণ করা হয় যা principle of causation এর সম্পূর্ণ বিপরীত ধারণা পেশ করছে।

The quntum mechanics theory maintains that at the atomic level, matter behaves randomly. কোয়ান্টাম মেকানিকস-থিউরির বক্তব্য হলো, পরমাণুর পর্যায়ে বস্তু এলোমেলোভাবে কাজ করে। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কোনো মূলনীতির অর্থ এই যে, তা সমগ্র বিশ্বে একইরূপে কাজ করবে। যদি একটি বিষয়ও এমন পাওয়া যায় যেখানে এ মূলনীতি কার্যকর নয় তখন সে মূলনীতির বিজ্ঞানময়তায় সন্দেহ অনুপ্রবেশ করে। সে হিসেবে যখন আবিস্কৃত হলো যে, পরমাণুর পর্যায়ে বস্তুর আচরণ সোলার সিসটেমের পর্যায়ের আচরণ থেকে ভিন্ন তখন principle of causation তথা কারণতত্ত্ব তার বিজ্ঞানময়তা খুঁয়ে বসে।

এ বিষয়টি আইনস্টাইন এর কাছে দুর্বোধ্য মনে হলো, তাই তিনি জীবনের শেষ ৩০ বছর এই প্রচেষ্টায় কাটালেন যে, প্রকৃতির দ্বিমুখী আচরণকে কীভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। সোলার সিসটেম ও পারমানবিক সিসটেম, এ দুটিকে কীভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। সোলার সিসটেম ও পারমানবিক সিসটেম, এ দুটিকে কীভাবে একই নিয়মের আওতায় শৃঙ্খলিত করা যায়। কিন্তু আইনস্টাইন তাঁর চেষ্টায় ব্যর্থ হলেন এবং এ বিষয়টি অমীমাংসিত রেখেই তিনি মৃত্যুবরণ করলেন।

Entrain spent the last 30 years of his life trying to reconcile these seeming contradictions of nature. He rejected the randomness of quantum mechanics. ``I cannot believe that God plays dice with the cosmos, " he said.

আইনস্টাইন তাঁর জীবনের শেষ ৩০ বছর এই প্রচেষ্টায় কাটিয়েছেন যে, প্রকৃতির এই প্রকাশ্য বিপরীতমুখী আচরণকে কীভাবে এক সুতোয় গাঁথা যায়। তিনি কোয়ান্টাম মেকানিকস্ এর এলোমেলো ভাবকে মানতে রাজি হলেন না। তিনি বলেন, আমি বিশ্বাস করতে পারি না যে, স্রষ্টা এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নিয়ে জুয়া খেলছেন। 'এ রকম মনে হচ্ছে যেন পবিত্র কুরআনের বর্ণনা মহাবিশ্বকে শক্ত করে ধরে আছে। সৌরজগৎ পর্যায়ে আচরণবিধির গবেষণা অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীদে মানুষকে এ অভিমতে পৌঁছাল যে, সৌরজগতের আচরণ কিছু জানাশোনা কারণ হেতু সম্পাদিত হচ্ছে। এ ধারণা ছিল। স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন খোদার কুরআনিক ধারণার বিপরীতে। কিন্তু বিজ্ঞানের প্রবাহ যখন খানিকটা আগে বাড়ল তখন কুরআনিক ধারণাই পুনঃবার বিজয় কেতন উড়িয়ে দিল। বিংশ

শতাব্দীতে পারমাণবিক জগৎ কেন্দ্রিক গবেষণা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করল পারমাণবিক পর্যায়ে এর অনুগুলোর মুভমেন্টের সুনির্ধারিত কোনো কায়দা কানুন নেই। জনৈক বিজ্ঞানী এ বিষয়ে অভিমত ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেনঃ

The laws of physics discovered on earth contain arbitrary numbers. like the ratio of the mass of an electron to the mass of a proton, which is roughly 1840 to one, why? did a creator arbitrarily chose these numbers? (Ian Roxburgh)

এ পৃথিবী বক্ষে আবিষ্কৃত পদার্থবিদ্যার কায়দাকানুন বিধিবহির্ভূত সংখ্যার উপর শামিল। যেমন ইলেক্ট্রনে বস্তুর পরিমাণের হার প্রোটনে বস্তুর পরিমাণের হারের তুলনায় –যা প্রায় ১৮৪০ মাত্র একভাগ। কেন? এটা কি কোনো স্রষ্টা তার সার্বভৌম, বিধিবহির্ভূত ইচ্ছায় নির্বাচন করে রেখেছেন? (সানডে টাইমস, লন্ডন, ৪ ডিসেম্বর ১৯৭৭ইং)

এটা বিজ্ঞানের মুখে একথারই স্বীকারোক্তি যে, এ বিশ্ব মানুষের জ্ঞানের আওতায় আসার মতো কোনো জিনিস নয়। বরং এ বিশ্ব সার্বভৌম ইচ্ছার অধিকারী এক স্রষ্টার মর্জির বহিপ্রকাশ। এবং আলাহর মর্জিকেন্দ্রিক ধারণার ভিত্তিতেই এর ব্যাখ্যা বিশেষণ সম্ভব।

ধর্ম ও আধুনিক বিজ্ঞান ঃ প্রাসঙ্গিক রচনা

Anthropology তথা মানবিকবিজ্ঞান সংক্রন্ত গবেষণা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ইতিহাসের পরম্পরায় ধর্ম ঠিক ততটুকুই পুরনো যতটুকু মানুষের অস্তিত্ব। বিশ্ব বক্ষে যখন থেকে মানুষের হৃদস্পন্দন শুরু তখন থেকেই অঙ্গাঙ্গিভাবে বিরাজমান থেকেছে ধর্ম। আজ পর্যন্ত এমন কোন মনুষ্য সমাজ পাওয়া যায়নি, যা আকীদা বিশ্বাস থেকে সম্পূর্ণ শূণ্য। এমনকি বর্তমান যুগ, যাকে অধর্ম ও নাস্তিকতার যুগ বলে আখ্যায়িত করা হয়, এ যুগের মানুষরাও ধর্মীয় ভাবধারা থেকে শূন্য নয়। ধর্ম এখনো জীবিত, যেমনটি ছিল পূর্বে। আধুনিক বিশ্বে গতানুগতিক ধর্মীয় সম্প্রদায়ের বাইরে যে বুদ্ধিজীবী মহল রয়েছে তাদেরকে বড় দুটি দলে ভাগ করা যায়। এক. স্রষ্টা ও ধর্ম অস্বীকারকারী সম্প্রদায় যাদের সাধারণত নাস্তিক (Atheist) বলা হয়। দুই. যারা প্রচলিত ধর্মীয় কাঠামোগুলোর কোন একটির সঙ্গে জড়িত তবে তাদের নিজস্ব ব্যাখ্যা বিশেষণের আলোকে। প্রথম গ্রুপের প্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্ব হিসেবে বার্ট্রান্ড রাসেলের (১৮৭২-১৯৭০) নাম উলেখ করা যেতে পারে এবং দ্বিতীয় গ্রুপের একটি অনন্য উদাহরণ হিসেবে আলবার্ট আইনস্টাইনের (১৮৭৯-১৯৫৫) নাম বিশেষভাবে উলে-খযোগ্য।

প্রথম দল : বার্ট্রান্ড রাসেল

বার্ট্রান্ড রাসেল অস্বাভাবিক ধীশক্তির অধিকারী ছিলেন। তিনি দীর্ঘ জীবন পেয়েছিলেন। কৈশোর যৌবন ও বার্ধক্যের সবটুকুই তিনি অধ্যায়নে কাটিয়েছেন। তাঁর জীবনী গ্রন্থ ও অন্যান্য বই পড়লে মনে হয় যে, জীবনের উষালগ্ন থেকে রাসেল যে জিনিসের ভক্ত ছিলেন তা হল Certainty নিশ্চয়তা, তিনি অস্থিমজ্জায় একজন জ্ঞানপিপাসু ছিলেন। তবে তিনি শুধু ঐ জ্ঞানেরই বন্দনা করতেন যার বাস্তবতার উপর তিনি নিশ্চিত হতে পারতেন। তার এ মানসিকতার কারণেই তিনি প্রথমে গণিত শাস্ত্রে আসক্ত হলেন। তিনি লিখলেন যে, সে সময় আমার অনুভূতি এমন ছিল যে, আমি ধর্মের শক্তিশালী বিকল্প পেয়ে গেছি বলে মনে হলো। গণিতে Logical Certainty রয়েছে বলেই তাঁর এ অনুভূতি পড়েছে। তাঁর মনে হল যে, গণিত শাস্ত্রের আকৃতিতে তিনি তাঁর কাঙ্খিত জ্ঞানের সন্ধান পেয়েছেন। পক্ষান্তরে ধর্ম তাঁর কাছে কিছু অতিপ্রাকৃতিক Superstiton ধারণার সমষ্টি বলে মনে হল। এ কারণে বার্ট্রান্ড রাসেল প্রচলিত ধর্মসমূহে বিশ্বাস না করে গণিত শাস্ত্রকে তার ধর্মব্রত হিসেবে গ্রহণ করলেন।

কিন্তু পরবর্তীকালে আরো ব্যাপক ও পরিপক্ক পড়াশোনার ফলে রাসেলের উপরোলিখিত আত্মবিশ্বাসে চিড় ধরল। তিনি আবিষ্কার করলেন যে, তাঁর বিশ্বাসের ভিত অগভীর ও অপরিব্যপ্ত অধ্যায়ন প্রসূত। গভীর অধ্যায়ন ও গবেষণা এর সত্যতা প্রমাণ করে না।

বার্ট্রান্ড রাসেলের পরবর্তী গবেষণার ফলাফল তাঁর গ্রন্থ 'Human Knowledge' (মানব জ্ঞান) এ দেখা যায়। এ গ্রন্থে অকাট্য প্রমাণাদি সাপেক্ষে দেখিয়েছেন যে, বিরাজমান পৃথিবীতে মানবিক গবেষণালব্ধ জ্ঞান কখনও কাউকে নিশ্চিত জ্ঞান পর্যন্ত পৌঁছায় না। একদিকে মানবচিন্তার

সীমাবদ্ধতা, অন্যদিকে বিশ্বের রহস্যজনক প্রকৃতি নিশ্চিত জ্ঞানের পথে একটি দুর্ভেধ্য বাধা। মনুষ্য জ্ঞানের শেষ সীমানা নিশ্চয়তা (Certainty) নয়, বরং সম্ভাবনা (probability) অন্যভাবে বলতে গেলে বাস্তবতা (Reality) কে আমরা সরাসরি আবিস্কার করতে সক্ষম নই। আমরা শুধু এতটুকু জানতে পারি যে, এখানে ওমুক সত্যের উপস্থিতির সম্ভাবনা আছে, যদিও তা আমাদের সরাসরি নিরীক্ষার বলয়ে আসছে না।

বার্ট্রান্ড রাসেলের জীবনব্যপ্ত গবেষণা যে মোহনায় তাঁকে পৌঁছিয়েছে সেখানে তিনি ধর্ম থেকে মাত্র এক বিঘত দূরে অবস্থান করছিলেন। ইসলামী পরিভাষায় বলতে গেলে বলতে হয় তিনি লা-ইলাহার মঞ্জিল পর্যন্ত পৌঁছে ছিলেন কিন্তু ইলালাহর গন্ডি পেরিয়ে ওপারে যেতে পারেননি। মৃত্যুর সনির্বন্ধ নিয়মে তাকে চলে যেতে হয়েছে পরপারে।

মানুষের জ্ঞান শুধু সম্ভাবনা (probability) পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারে, রাসেলের এ উক্তি কোন ব্যক্তিগত মন্তব্য নয়। এ হল বর্তমান বিশ্বের সকল বিজ্ঞানীদের একক অভিব্যক্তি। এ মূলনীতিটি আধুনিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এটাই প্রমাণিত করে যে, অন্ততপক্ষে বর্তমান বিজ্ঞানের আলোকে বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যে সে পার্থক্য আর রইল না যা পুরনোকালে ধর্ম ও বিজ্ঞানের মাঝে মনে করা হতো। এখন বৈজ্ঞানিক যুক্তি Reason ঠিক ঐ স্থানে দাঁড়িয়েছে যেখানে পূর্বে দাঁড়িয়েছিল বিশ্বাস Belief । ধর্মের অবস্থান পূর্ব থেকেই এরকম ছিল যে, মহাসত্য হল একটি গায়েবী জিনিস। যা অদৃশ্য জগৎ unsean world – এর সাথে সম্পৃক্ত। আমাদের পক্ষে শুধু এতটুকু সম্ভব যে, আমরা বাহ্যিক কিছু ইশারা ইঙ্গিতের ভিত্তিতে শুধু ধরে নিতে পারি যে, ওমুক সত্যের উপস্থিতি এখানে রয়েছে যদিও তা দৃষ্টির অগোচরে। আধুনিক বিজ্ঞানও ঠিক সমান্তরাল রেখায় অবস্থান নিচ্ছে। আধুনিক বিজ্ঞানের বক্তব্য হল, আমরা মূল জিনিসকে দেখতে পারি না, আমরা কেবল বাহ্যিক প্রতিক্রিয়া থেকে deduction করতে পারি যে, এখানে অমুক জিনিস রয়েছে, যদিও তা আমাদের সরাসরি দৃষ্টি অথবা নিরীক্ষার আওতায় আসছে না। বার্ট্রান্ড রাসেল ও তাঁর সমমনাদের জন্য অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে যে, সম্ভাবনার (probability) ভিত্তিতে ধর্মের সত্যতাকে ঠিক একই রূপে স্বীকার করে নেবেন যেমনটি তারা করে থাকেন বৈজ্ঞানিক থিউরিসমূহের সত্যতা স্বীকারের ক্ষেত্রে। একই রেখায় অবস্থিত দুটি জিনিসের একটিকে স্বীকার করে অন্যটিকে অস্বীকার করার কোন অর্থ হয় না। তাঁদের জানা উচিত যে, ধর্মকে স্বীকার করা অথবা অস্বীকার করা এ দুয়ের মধ্যে একটিকে বেছে নেয়ার প্রশ্ন এখানে নয়। বরং ধর্মকে মেনে নেয়া অথবা নিজ সত্ত্বা তথা বিদ্যাবুদ্ধিকে অস্বীকার করা এ দুয়ের মধ্যে যে কোন একটিকে বেছে নেয়া ছাড়া তৃতীয় কোন বিকল্প নেই। যদি তারা ধর্মকে অস্বীকার করতে রাজি হন তাহলে তাদের স্বীয় স্বত্তাকেও অস্বীকার করতে হবে। আর যেহেতু নিজ সত্তার অস্বীকৃতি কখনো সম্ভব নয় সেহেতু ধর্মকে অস্বীকার করাও তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়।

দ্বিতীয় দল : আইনস্টাইন

দ্বিতীয় দলের এক বিশেষ ব্যক্তিত্ব হলেন আইনস্টাইন। বৈজ্ঞানিক গবেষণায় আইনস্টাইন তাঁর পুরোটা জীবন কাটিয়েছেন, তবে এর পাশাপাশি আধ্যাত্মিক চেতনাও তাকে আলোড়িত করেছে। অতঃপর ধর্ম বিষয়েও তিনি সমানভাবে গবেষণা করেছেন। ধর্মের ব্যাপারে তাঁর বিশ্বাস এতটুকু গভীর ছিল যতটুকু ছিল বিজ্ঞানের ব্যাপারে। কিন্তু তার দর্শন অনুসারে ধর্ম ও বিজ্ঞানের বিষয় বস্তুতে বিস্তর তফাৎ রয়েছে। বিজ্ঞানের সাধনা হল, (কী?) (what is) এ প্রশ্নের উত্তর তালাশ করা। পক্ষান্তরে ধর্ম কি হওয়া উচিৎ (what Should be) এর উত্তর প্রদানে ব্যস্ত থাকে। অন্য কথায় বলতে গেলে ধর্মের ক্ষেত্র হল অভ্যন্তরীণ বিশ্বাস, পক্ষান্তরে বিজ্ঞানের ক্ষেত্র বহির্বিশ্ব। এ বিভাজন সুন্দর হলেও যথেষ্ট নয়। এ বিভাজন সত্ত্বেও আসল সমস্যা তার জায়গাতেই থেকে যায়, যার কারণে বিজ্ঞান ও ধর্মের প্রশ্ন দাঁড়িয়েছে। নিছক বিজ্ঞানের আলোকে উক্ত বিভাজনের কোন উপকারিতা নেই। কারণ, আসল প্রশ্ন হল, বিজ্ঞান ও ধর্মকে সমান্তরাল রেখায় দাঁড় করানো। ধর্ম ঐশিক আর বিজ্ঞান মানবিক। অতঃপর এমন একটি ফর্মূলার প্রয়োজন যা মানবিক ও ঐশী জ্ঞানকে এক করতে পারবে। তা না হলে মানুষের মধ্যে ঐ পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি হবে না মনোবিজ্ঞানের ভাষায় যাকে (integrated personality) বলে। বার্ট্রান্ড রাসেল ও তাঁর অনুসারীদের ভুল তো এটা যে তাঁরা সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে ব্যর্থ হয়েছেন। পক্ষান্তরে আইনস্টাইন ও তাঁর অনুসারীরা এখানে ভুল করেছেন যে,

তাঁরা ধর্মের প্রকারভেদকে সঠিকভাবে বুঝতে পারেননি। এবং এ ব্যাপারে অজ্ঞতার কারণে নিতান্তই ব্যক্তিগতভাবে ধর্মের এমন কাঠামো দাঁড় করিয়েছেন যা বাস্তবতা বিবর্জিত। এ গ্রুপের লোকদের ভুল এখানে যে, তাঁরা প্রচলিত ধর্মসমূহকে ধর্মের প্রতিনিধি হিসেবে বিবেচনা করেছেন। দুনিয়াতে এক ডজনের মত বড় ধর্ম (major religions) রয়েছে, এগুলোর বাইরেও রয়েছে হাজার হাজার ধর্ম। এরা সব ধর্মকে শিক্ষা অন্য ধর্ম থেকে ভিন্ন। ধর্মসমূহে ঐ ঐক্যতান নেই যা বিজ্ঞানে রয়েছে। এ জন্য তাঁরা মন্তব্য করে বসলেন ধর্ম ব্যক্তিগত ব্যাপার। যে ব্যক্তি যে ধর্মীয় বিশ্বাসে বিশ্বাসী সেটাই তার ধর্ম। অন্য কোন ব্যক্তির তাতে দখল দেয়ার কোন প্রয়োজন নেই। ধর্মীয় ব্যাপারে এহেন ধারণা ধর্মকে অস্বীকার করার নামান্তর।

ধর্ম কী? ধর্ম এমন একটি পূর্ণাঙ্গ আইডিওলজি যা মানুষ ও বিশ্বের তৃপ্তিদায়ক ব্যাখ্যা দিতে পারে, যাতে মানুষ সকল প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পায়। ধর্ম মানুষের জন্য বিশ্বাসের ঝরনাধারা। যে ধর্ম পূর্ণাঙ্গসত্যবাহী নয় তা মানুষের বিশ্বাসের উৎস হতে পারে না। যে ধর্ম মানুষকে নিশ্চিত বিশ্বাস উপহার দিতে পারে না সে ধর্ম আদৌ কোন ধর্ম নয়। আধুনিক বিজ্ঞানীদের গবেষণায় মূলত কিছু ত্রুটি রয়েছে যার দরুন ধর্মকে সঠিকভাবে বুঝতে তাঁরা সক্ষম হননি।

১. প্রথম কথা হল বিরাজমান ধর্মসমূহের প্রত্যেকটিকে বিশ্বস্ত (Authenticated) ধর্ম হিসেবে ধরে নিয়ে তার আলোকে ধর্মীয় গবেষণায় আত্মনিয়োগ করা প্রাচীন জ্যোতিষিবিদ্যা Astrology আধুনিক সৌরবিজ্ঞান Astronomy এর সাথে একাকার করে তার সমষ্টি নিয়ে গবেষণা করে নতুন এক সৌরবিজ্ঞান উদ্ভাবনের প্রয়াসে মনোনিবেশ করার মতো। এ ব্যাপারে বৈজ্ঞানিক গবেষণা পদ্ধতি তো এই যে, অপ্রতিষ্ঠিত ধারণা ও কল্পনাসমূহকে পৃথক করে শুধু প্রতিষ্ঠিত ডাটাসমূহের ভিত্তিতে সৌরবিজ্ঞানের বুনিয়াদ রাখা হবে। ধর্মীয় গবেষণার ক্ষেত্রে ঠিক একই পথ অবলম্বন করতে হবে। এটা সত্য যে, বর্তমান বিশ্বে অনেক ধর্মীয় স্ট্রাকচার রয়েছে। কিন্তু বিজ্ঞানের শক্ত মানদণ্ডে যাচপর্তাল করলে প্রমাণিত হবে যে, সকল ধর্ম এক পর্যায়ের নয়। প্রচলিত ধর্মসমূহে এমন কিছু ধর্মের সাক্ষাৎ মিলবে ইতিহাসের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে হাজার বার হাতরিয়েও যার কোন উন্মেষকাল খুঁজে পাওয়া যাবে না। ঐতিহাসিক সত্যতা (historical credibility) যে ধর্মের মেরুদণ্ডকে শক্তি যোগাচ্ছে না যে ধর্ম গবেষণা সূচিতে আদৌ আসার উপযুক্ত নয়। এছাড়া এমন কিছু ধর্ম রয়েছে যার ব্যাপারে বুকে হাত দিয়ে বলা যাবে না যে তার পবিত্র (text) তথা বাণীসম্ভার সন্দেহযুক্ত তার সত্যতায় কীভাবে বিশ্বাস করা সম্ভব।

ধর্ম সমষ্টির মধ্যে একমাত্র ইসলামই ব্যতিক্রমধর্মী যা বৈজ্ঞানিক গবেষণার সকল মানদণ্ডের সামনে শক্তপদে দাঁড়িয়ে থাকার সকল বৈশিষ্ট্যে বিশেষিত।

এমতাবস্থায় বিরাজমান সকল ধর্মকে এক সারিতে দাঁড় করিয়ে সেগুলো থেকে কোন নির্যাস বের করার চেষ্টা করা নেহায়েত অবৈজ্ঞানিক একটি পদক্ষেপ বৈ অন্য কিছু নয়। বৈজ্ঞানিক মানদণ্ডের পরখে যে ধর্ম সঠিক, তা রেখে অন্য গুলোকে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের করিডোরে পাঠিয়ে দেয়াই হবে একমাত্র বিজ্ঞানসম্মত কাজ।

২. ইসলামকে ধর্মের বিশ্বস্ত এডিশন মানার পর ঐ সব ভুলভ্রান্তিসমূহ আবছে আব অন্তর্লীন হতে থাকবে যা সকল ধর্মকে এক পাটফার্মে দাঁড় করার কারণে সৃষ্টি হয়েছে। বিশ্ব প্রকৃতির ব্যাপারে লোক- ধারণাসমূহকে পৃথক করে নিরেট বৈজ্ঞানিক ভিক্তির উপর গবেষণা করলে যেমনটি হবে ঠিক তেমন।

৩. ইসলামকে ধর্মসমূহের মধ্যে একমাত্র প্রতিনিধিত্বকারী মেনে নিলে আমাদের এমন এক নির্ভরযোগ্য সোর্স হাতে এসে যায়, যার দ্বারা ধর্মীয় আকীদা বিশ্বাসসমূহকে একটি একক নীতিমালার আওতাভুক্ত করা যায়।

ইসলাম একটি নেয়ামত:

বর্তমান যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নতি সাধন ঠিক তখনি সম্ভব হয়েছে যখন প্রতিটি শাখা হতে অবৈজ্ঞানিক ধ্যান-ধারণাসমূহকে পৃথক করে দেয়া হয়েছে এবং নিরেট বৈজ্ঞানিক বাস্তবতার শক্ত বুনিয়াদের উপর সকল জ্ঞান ও বিজ্ঞানকে ঢেলে সাজানো হয়েছে। ধর্মের ক্ষেত্রেও আমাদের এ নীতি অবলম্বন করতে হবে।

ধর্মীয় ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক মানদণ্ডের সঠিক প্রয়োগের মাধ্যমে প্রমাণ করতে হবে যে, কোন ধর্ম অবিকৃত অবস্থায় এখনো বর্তমান রয়েছে এবং কোন ধর্ম বিকৃত ও পরিবর্তিত হয়ে বৈজ্ঞানিক বিশ্বস্ততা হারিয়ে ফেলেছে।

এক্ষেত্রে বলা বাহুল্য যে, ইসলামই একমাত্র ধর্ম যা নিরেট বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার আলোকে (authentic) তথা বিশ্বস্ত বলে প্রমাণিত। ইসলামের text, ইতিহাস, শিক্ষা এমনকি এর text এর ভাষা আজো পর্যন্ত সেই পূর্বেকার আকৃতিতেই রয়েছে। ইসলাম আমাদরেকে বিশ্বাসযোগ্য ধর্মীয় নীতিমালা প্রদানের সাথে সাথে ধর্মীয় জীবন গঠনে যা প্রয়োজন সব কিছুই অত্যন্ত সুন্দরভাবে প্রদান করেছে।

সমাপ্ত